টের রক্ত

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬২

প্রকাশক

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

৮৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর

শম্ভূনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট কলিকাতা-৬

অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

ফ্যান্সী প্রিন্টিং কোম্পানী

বাঁধাই

এশিয়াটিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

চার টাকা

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
বন্ধুবরেষু—

লেখকের অন্যান্য বই—

অসমতল
হলদে বাড়ি
দ্বীপপুঞ্জ
উল্টোরথ
পতাকা
চড়াই উৎরাই
শ্রেষ্ঠ গল্প
অক্ষরে অক্ষরে
দেহমন
গোধূলি
সঙ্গিনী
চেনামহল
কাঠগোলাপ
অসবর্ণা
দূরভাষিণী
ধূপকাঠি

ক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভবেশ দত্ত তাঁর চেম্বারে বসে বীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে একজন যুবক রোগীর চোখ পরীক্ষা করছিল। সিনিয়রের আদেশ নির্দেশের জন্যে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল ভবেশের তরুণ সহকারী স্থরজিৎ সেন।

খানিকবাদে রোগীর দিকে তাকিয়ে বরাভয়ের হাসি হাসল ভবেশ, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই মিঃ লাহিড়ী। তবে চশমা আপনাকে নিতেই হবে।'

রোগী ক্ষীণ আপত্তি করল, 'না নিলে চলবে না?'

ভবেশ স্মিত মুখে মাথা নাড়ল, তারপর সহকারীর দিকে তাকাতেই সে রোগীকে বলল, 'মিঃ লাহিড়ী, আপনি আমার সঙ্গে এঘরে আস্থন।'

একজন রোগীর জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দেওয়ার জো নেই ভবেশের। বাইরের বসবার ঘরে আরও পেশেণ্ট অপেক্ষা করছে। কেসগুলি দেখে আজ একটু তাড়াতাড়িই বেরুতে হবে। হার্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ নাগের বাড়িতে পার্টি আছে। তাঁর মেয়ের আজ জন্মদিন। সেই উপলক্ষে সস্ত্রীক ভবেশের নিমন্ত্রণ। সেজেগুজে ডলি হয়ত এতক্ষণ ছটফট শুরু করেছে।

অ্যাসিস্টাণ্টের দিকে তাকিয়ে ভবেশ বলল, 'স্থরজিৎ, প্রিন্সিপ্যাল সেনের রেকমেণ্ডেশন নিয়ে যে ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে ডাকো এবার। আমি ওঁর ছাত্র ছিলাম। গুরুদক্ষিণা প্রতি বছরই কিছু কিছু দিতে হয়। তিনি যেসব পেশেণ্ট পাঠান, তা হয় অর্ধমূল্যে না হয় বিনামূল্যে।'

ভবেশ একটু হাসল, সে হাসি দাক্ষিণ্যের নয়।

স্থরজিৎ বলল, 'স্যার, নলিনী দেবী নামে একজন মহিলা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। তিনি আমাকে এরই মধ্যে কয়েকবার

অনুরোধ করেছেন, তাঁর কেসটা একটু আগে দেখে দেওয়ার জন্যে। তিনি অনেক দূর—সেই দমদম থেকে এসেছেন।

ভবেশ এবার কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল, 'খুব যে ওকালতি করছ, জানাশোনা আছে নাকি?'

সুরজিৎ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না স্যার।'

'তবে আর কি, একটু বিশ্রাম করুন না বসে। দমদমের বাস রাত বারটা পর্যন্ত চলে। এখনতো সবে ছটা। কারো চিঠিপিঠি নিয়ে এসেছেন নাকি?'

সুরজিৎ বলল, 'সেকথা তো কিছু বলেন নি।

ভবেশ বলল, 'তবে? তুমি এত সুপারিশ করছ কোন ভরসায়? দেখেশুনে কি মনে হয়? ষোল টাকা ভিজিট দিতে পারবে না শেষে ধরাপড়া শুরু করবে?'

সুরজিৎ একথার কোন জবাব দিল না। সহকারীর কাছে এতখানি স্থূলতা প্রকাশ করে যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল ভবেশ। সুরজিতের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে পরিহাসতরল স্বরে বলল, 'আচ্ছা ডাকো, তোমার নলিনী দেবীকেই ডাকো।'

মিনিট খানেক বাদে নবাগতাকে সঙ্গে নিয়ে এল বেয়ারা। আর তাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ভবেশ ডাক্তার বলে উঠল, 'তুমি!'

তারপর সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা তুমি যাও সুরজিৎ। লাহিড়ীর কেসটা অ্যাটেণ্ড করো গিয়ে। আমি এসে দেখছি।'

হাসি গোপন করে সুরজিৎ পাশের ঘরে চলে গেল।

তারপর একটু কাল চুপচাপ রইল দুজনে। একটু সময় নিল ভবেশ। ভারি রোগাটে হয়ে গেছে নলিনীর চেহারা। মুখে কিসের একটা রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। হিসেবমত বয়স তো এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। কিন্তু দেখে মনে হয়, আরও বেশি। সেই রঙের জলুস রূপের ঔজ্জ্বল্য আর নেই নলিনীর। বেশবাসও খুব সাধারণ রকমের। কম দামী সাদা খোলের একখানা তাঁতের শাড়ি পরনে, খয়েরী রঙের পাড়, আধখানা আঁচল মাথায় তুলে দিয়েছে। সিঁথিতে সিঁদুরের

রেখাটি বেশ পুরু আর স্পষ্ট। গলায় একগাছি সরু হার আছে। আর হাতে দুগাছি চুড়ি। এছাড়া আর কোন আভরণ নেই।

ভবেশ গম্ভীরভাবে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।'

ঠিক সামনাসামনি বসল না নলিনী, পাশের গদি আঁটা বেঞ্চটার এক কোণে গিয়ে বসল। তারপর একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকারে পড়ে এসেছি।'

ভবেশ বলল, 'তা জানি। আমার কাছে অ-দরকারে কেউ আসে না। তোমার চোখে অসুখ হয়েছে? কি ট্রাবল বলো।'

নলিনী একটু হাসল। 'তুমি নিজে নিশ্চয়ই মনে মনে জানো চোখের চিকিৎসার জন্যে তোমার কাছে আসিনি।'

ভবেশ বলল, 'ও। কিন্তু অন্য কোন রোগের চিকিৎসা তো আমি আজকাল আর করিনে। তাতে আমার নিজের প্র্যাকটিস সাফার করে। তাছাড়া সময়ও হয়না।'

নলিনী এবার চোখ তুলে ভবেশের দিকে তাকাল, তারপর একটু হেসে বলল, 'তোমার দামী সময় তাহলে আর নষ্ট করব না। আমার কথাটা বলি। গীতার সম্বন্ধ ঠিক করেছি।'

ভবেশ ভ্রূ-কুঁচকে বলল, 'গীতা! গীতা কে!'

এ প্রশ্নের জবাবে নলিনীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। চোখ নামিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল নলিনী।

ভবেশের এবার মনে পড়ে গেল। অদ্ভুত হাসি ফুটল তার মুখে। 'ও তোমার সেই মেয়ে? বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছ? বেশ বেশ, তা আমি কি করতে পারি বলো। টাকার দরকার বুঝি, কত টাকা দিতে হবে বলো।'

কোটের পকেট থেকে সেভিংস অ্যাকাউণ্টের চেক বইটা বের করে ফেলল ভবেশ।

নলিনী মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমি টাকার জন্য তোমার কাছে আসিনি।'

'তবে?'

নলিনী মৃদুস্বরে বলল, 'বিয়ের চিঠি এখনো ছাপতে দিইনি। তুমি যদি অনুমতি দাও, তোমার নামে চিঠিটা ছাপতে দিই।'

ভবেশ স্থির জলন্ত দৃষ্টিতে নলিনীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর আস্তে কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'তুমি নিজেই জানো নলিনী কি অসঙ্গত অসম্ভব প্রস্তাব তুমি করছ। অন্যের সন্তানের পিতৃত্ব যদি স্বীকারই করতাম, তাহলে উনিশ বছর আগেই তা করে ফেলতাম। তোমার বাবা-মা তখন অনেক চেষ্টা করে দেখেছিলেন। উৎপীড়ন অত্যাচারের কিছুই বাকি রাখেননি।'

'তাঁদের কথা আর কেন তুলছ। তাঁরা তো আর নেই।'

'কিন্তু তুমি তো আছ। তোমার তো কিছুই ভুলে যাওয়ার কথা নয়। তবু তুমি কোন সাহসে—'

নলিনী বলল, 'সাহসের জোরে আসিনি। ভেবেছিলাম মেয়েটার সুখশান্তির কথা ভেবে তোমার মনে যদি একটু দয়া হয়, তোমারও তো ছেলেমেয়ে হয়েছে।'

ভবেশ একটু হাসল, 'তা হয়েছে। কিন্তু এতো শুধু দয়ামায়ার কথা নয় নলিনী, এর সঙ্গে মানমর্যাদার প্রশ্নটাও জড়িয়ে রয়েছে যে। জানো তো এই কলকাতা শহরে আমাকে ডাক্তারি ব্যবসা করে খেতে হয়—।'

নলিনী বলল, 'তা জানি। আমারই ভুল হয়েছিল। অনর্থক তোমাকে বিরক্ত করে গেলাম। আমাকে ক্ষমা কোরো।'

মুহূর্তকাল দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। মনে হলো আশাভঙ্গে নলিনীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে।

ভবেশ বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও। তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও। কোথায় থাক আজকাল ?'

নলিনী বলল, 'তোমাদের বালীগঞ্জ থেকে অনেক দূরে।'

'তা হোক, রাস্তার নাম ঠিকানা বলো' নলিনীর ঠিকানাটা পকেট ডায়েরিতে লিখে নিল ভবেশ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি কর আজকাল ? মাস্টারী ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'
'দমদমেরই একটা স্কুলে।'
একটু চুপ করে থেকে ভবেশ ফের জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মেয়ের বিয়ে কবে ?'
'দিন তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। ভেবেছিলাম তো এই শ্রাবণ মাসের মধ্যেই, দেখি কি হয়।'
ভবেশ বলল, 'তাহলে তো এখনো দেরি আছে।'
'দেরি আর কই। সপ্তাহ দুই মাত্র বাকি। এখনোতো সবই পড়ে রয়েছে। আচ্ছা যাই তোমার রোগীরা নিশ্চই আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে।'
ভবেশ বলল, 'রোগীদের ডাক্তার কি করছে তা বললে না।'
একথার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী বেরিয়ে গেল।
নলিনী চলে যাওয়ার পর কি একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ভবেশ।
একবার ভাবল অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে বলে দেয় তার মাথা ধরেছে। সব রোগীকে আজকের মত বিদায় করে দিক, কিন্তু তাকি ভবেশের মত একজন মর্যাদাবান ডাক্তারের পক্ষে শোভন হবে? তাই সে অশোভন কিছু করল না। যন্ত্রের মত কাজ করে গেল। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রোগী দেখল, সুরজিৎকে পরের দিনের কাজ সম্পর্কে যথারীতি উপদেশ নির্দেশ দিল, তারপর ধর্মতলার সেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে ছুটল বালীগঞ্জের দিকে। ড্রাইভ করতে গিয়ে মোটেই অন্যমনস্ক হয়ে অপটু হাতের পরিচয় দিল না ভবেশ। সুস্থ স্বাভাবিকভাবে অন্য দিনের মতই বাড়ি এসে পৌছল।
স্টেশন রোডের এই ছোট্ট সাদা দোতালা বাড়িটি ভবেশ সম্প্রতি তুলেছে। এ-বাড়িকে সাজিয়ে তুলবার ভার নিয়েছে ডলি নিজে। সামনে সারি সারি দেশী-বিদেশী ফুলের টব। জানালায় দরজায় রঙীন পর্দা। শোয়ার ঘরে শেডে ঢাকা নীলচে নরম আলো। বাড়িতো নয়, আর্টিস্টের আঁকা বাড়ির একখানি ছবি।
আর ছবির মতই সুন্দর ভবেশের স্ত্রী ডলি; বিলাত থেকে ফিরে

এসে ভবেশ ওকে বছর দশেক হলো বিয়ে করেছে। স্বচ্ছল সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, বয়স এখন সাতাশ আঠাশ হবে। দুটি ছেলে হয়েছে। কিন্তু ডলিকে দেখে কে বলবে তার বয়স কুড়ি পেরিয়েছে। তা ভবেশকে দেখেও তার আসল বয়েস বুঝবার জো নেই। পুষ্টিকর খাদ্যে, বাঁধা নিয়মকানুনে নিজের স্বাস্থ্যকে সে অটুট রেখেছে। না রাখলে কি চলে। নিজের চেহারা ডাক্তারের পেশার পক্ষে একটা বড় বিজ্ঞাপন। তেতাল্লিশ পেরিয়ে গেলেও ভবেশকে দেখলে মনে হয় না যে, তার বয়স তেত্রিশ বছরের ওপরে।

স্বামীকে দেখে ডলি একটু অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'আজও তোমার সেই সাড়ে আটটা। পাঁচ মিনিট আগে ফিরতে পারলে না বুঝি। ডাঃ নাগের মেয়ের জন্মদিনে যেতে হবে না! দেরি দেখে তিনি কি ভাবছেন বলতো।'

ভবেশ হেসে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। তিনি নিজেও তো ডাক্তার। তিনি জানেন আমাদের সময় আমাদের হাতে নয়, রোগী-দের মুঠোয়।'

একবার অবশ্য ইচ্ছা হলো যে, ডলিকে বলে তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে। আজ আর সে নিমন্ত্রণে যাবে না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এই দুর্বলতাটা প্রকাশ করতে লজ্জা হলো ভবেশের। তাছাড়া একবার যদি বলে ফেলে, তার শরীর ভালো নেই, তাহলে কি আর রক্ষা আছে। ডলি হাজার প্রশ্ন তুলে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। আর শরীর ভালো না থাকার তো কোন কারণ নেই। কেন এমন একটা দৌর্বল্যের প্রশ্রয় দেবে ভবেশ?

তাই ভবেশ গাড়িতে চড়ে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণে গেল। সেখানকার সমশ্রেণী, সমবয়সী ও সমব্যবসায়ী বন্ধুদের সঙ্গে হাসি গল্প ঠাট্টা তামাসা করল, তারপর ফিরে এল বাড়িতে। না, আজকের চেম্বারের সেই ছোট একটু ঘটনায় ভবেশ ডাক্তারের মনে কি আচরণে কোন বৈলক্ষণ্যই ঘটেনি, যদি ঘটত তাহলে ডলি অন্তত সে কথা উল্লেখ না করে ছাড়ত না, স্বামীর চালচলন আচার আচরণ সম্বন্ধে তার দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ, ডলি ভবেশের ব্যারোমিটার। বিছানায় শুয়ে স্ত্রী

যখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে তখন ভবেশেরও ঘুমিয়ে পড়া দরকার। কিন্তু বার বার ঘুমোবার চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারল না ভবেশ, উনিশ বছর আগেকার টুকরো টুকরো কতকগুলি ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

নলিনীর সঙ্গে আজ যদি বেশি রূঢ় ব্যবহার করে থাকে ভবেশ তা মোটেই অন্যায় হয়নি। তার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। উনিশ বছর আগে এই নলিনী ভবেশকে বড়ই প্রবঞ্চিত করেছিল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে মুখ দেখাবার আর জো ছিল না ভবেশের। তখনকার সেই প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তের কথা আজও ভবেশের সমস্ত মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

তাদের যশোহর শহরেরই প্রতিপত্তিশালী পসারওয়ালা উকিলের মেয়ে নলিনী, তার রূপের খ্যাতি শহর ভরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভবেশের বাবারও খ্যাতি প্রতিপত্তি নেহাৎ কম ছিল না। শহরে ছ'খানা বাড়ি, গাঁয়ে তালুকদারী বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে সম্মান ছিল অমূল্য দত্তের। ভবেশ তখন মেডিক্যাল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। শুধু যে কলেজেই তার খ্যাতি তা নয়, খেলার মাঠে, ক্লাবের বক্তৃতায় তার সমান নৈপুণ্য। তাই ভবেশের সঙ্গে যখন নলিনীর সম্বন্ধ এল সবাই বলল, এ একেবারে রাজজোটক, ভবেশের বাবা মেয়ে দেখে পছন্দ করে এলেন, এসে বললেন, এমন সুলক্ষণা মেয়ে তিনি কখনো দেখেন নি। শুধু রূপ নয় গুণ যোগ্যতাও যথেষ্ট। ধনীর মেয়ে হলে কি হবে রান্নাবান্না সেলাই সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সব কাজ সে জানে। লেখাপড়া অবশ্য ঘরেই করেছে। ইংরেজী বাংলা যতটুকু শিখেছে একেবারে পাকা। হাতের অক্ষরগুলি একেবারে মুক্তোর মত। পণযৌতুকের যা ফর্দ পাওয়া গেছে তাতে অভিজাত পরিবারের মর্যাদা বজায় থাকবে।

ভবেশ অবশ্য মাথা নাড়ল, উঁহু সে পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে করবে না। বিয়ে যদি আদৌ করে, ডাক্তারি পাশ করে প্র্যাকটিস জমিয়ে তারপরে।

নলিনীর বাবা জিতেন বোস বললেন, 'বেশ তো বিয়ে না হয়

ক'-বছর পরেই হবে মেয়ে দেখে ভবেশের পছন্দ হয় কিনা সেইটাই বড় কথা।'

কিন্তু নলিনীকে দেখে আসবার পর ভবেশের মত বদলাতে আর দেরি হলো না। বন্ধুমহলকে জানিয়ে দিল, শুধু পাঠ্যাবস্থায় কেন যে কোন অবস্থায় এ মেয়েকে বিয়ে করা যায়।

ছেলের বাবা মেয়ের বাপ দুজনেই মুখ মুচকে হাসলেন। খুব ঘটা পটা আড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে বিয়ে হলো ভবেশের। শহরের প্রায় অর্ধেক লোক বিয়ের রাতে বউভাতে দু'বাড়িতে পোলাও মাংস খেল।

ফুলশয্যার রাত্রে স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে নিল ভবেশ, হেসে বলল, 'তুমি এত লাজুক কেন, মোটে কথাই বলছ না।' স্ত্রীর কাছ থেকে তবু কোন সাড়া না পেয়ে তার সুন্দর কোমল চিবুকটি তুলে ধরল ভবেশ। আর সঙ্গে সঙ্গে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল তার হাতে ঝরে পড়ল।

ভবেশ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'একি তুমি কাঁদছ! ছিঃ আজকের দিনে কেউ কাঁদে নাকি। কি হয়েছে বলো, তোমাকে কেউ কিছু বলেছে?'

নলিনী মৃদু স্বরে বলল, 'না।'

শুধু না আর না, আর শুধু কান্না। কিন্তু রূপবতীর কান্নারও রূপ আছে। যার চোখ সুন্দর তার চোখের জলও সুন্দর। ভবেশ ভাবল হয়ত বাবা মা ভাইবোনদের জন্যেই মন কেমন করছে নলিনীর। যদিও তার বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি সাত সমুদ্রের এপার ওপার না, নেহাতই এপাড়া থেকে ওপাড়ায়; তবু আদুরে মেয়ের প্রথম প্রথম মন খারাপ হয়ে যাওয়াটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। স্ত্রীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে বুকে টেনে নিল ভবেশ। চুমোয় চুমোয় মুখ ভরে দিল। একটু নোনতা স্বাদ লাগল অবশ্য। কিন্তু ভবেশ তা গ্রাহ্য করল না। সে কি জানে সেই কটুস্বাদ শুধু প্রথম রাত্রের না, তা জীবনের সমস্ত দিন রাত্রির।

ধরা পড়ল এক মাস পরে। অবশ্য তারও কিছুদিন আগে থেকে ভবেশদের অন্দরমহলে মেয়েদের মধ্যে ফিসফিস শুরু হয়েছিল। কিন্তু

মাসখানেক পরে কলঙ্কের কথাটি একেবারে সশব্দে উচ্চারিত হলো, দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নলিনীর বিয়ে হয়েছে।

ভবেশের বাবা মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন এখনই ত্যাগ কর, এখনই ত্যাগ কর। ও আপদ দূর করে দাও বাড়ি থেকে। ভবেশ স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বলল, 'তোমার চোখের জলের মানে এতদিন পরে বুঝলুম। কিন্তু এত কলঙ্ক, এত কালি কি ওই দু এক ফোঁটা জলে ধুয়ে যায়!'

নলিনীর চোখে এখন আর জল নেই। সে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল তারপর চোখ নামিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'না তা যায় না।'

ভবেশ বলল, 'তা যদি জানো তবে আমাকে এমন করে ঠকালে কেন?' একথার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর।'

'ক্ষমা! তোমার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই নলিনী। যাকে তুমি ভালোবেসেছিলে তাকেই কেন বিয়ে করলে না?'

নলিনী তেমনি মুখ নিচু করে বলল, 'আমি তো তাকে ভালোবাসিনি, সে জোর করে—'

এর পর নলিনী শুধু কাঁদতে লাগল। কাউকে আর কোন কথা সে বলল না, কি বলতে পারল না।

নলিনীর বাবা জিতেনবাবুকে খবর দেওয়া হলো, দোর এঁটে দুই বেয়াইয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। বাইরে থেকে মাঝে মাঝে তর্জন গর্জন শোনা গেল। মনে হলো দুজনের মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলছে। কিন্তু সে যুদ্ধ তখনকার মত বাকযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে নলিনীর বাবা বেরিয়ে এলেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে চলে গেলেন মেয়েকে নিয়ে। যাওয়ার আগে নলিনী নাকি ভবেশের সঙ্গে আর একবার দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভবশের বাবা-মা তাতে রাজী হননি। ভবেশের নিজেরও কোন আগ্রহ ছিল না। লজ্জায় ধিক্কারে তার সর্বাঙ্গ জলে যাচ্ছিল। তার

মত চতুর আর বুদ্ধিমান ছেলেকে কেউ কোনদিন ঠকাতে পারেনি। বন্ধুর দল হাজার চেষ্টা ক'রেও তাকে কোন বছর এপ্রিল ফুল করতে পারেনি। আর সারা জীবনের মত তাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল পনের ষোল বছরের একটি মেয়ে। হাজার শাস্তি দিলেও কি এই প্রবঞ্চনা, প্রতারণার শোধ যায়।

বাড়ির ঝি চাকরের কল্যাণে কথাটা মোটেই চাপা রইল না। সারা শহর ভরে ছড়িয়ে পড়ল। ভবেশ যেখানেই যায় মনে হয় একটু আগে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত, আধাপরিচিত—ভবেশ যার দিকেই তাকায় মনে হয়, সে মুখ টিপে হাসছে। ভবেশ অস্থির হয়ে উঠল। মানুষ জনের সঙ্গ সহ্য হয় না, নির্জনতাও অসহনীয়।

ওপক্ষ থেকে মিটমাটের নানারকম চেষ্টা হয়েছিল, প্রথমে ওরা খুব অনুনয় বিনয় করেছিল, যা হয়ে গেছে তারতো আর চার নেই। একটি মেয়ের সর্বনাশ ক'রে লাভ কি। ভবেশ দয়া করুক, ক্ষমা করুক, সে মেনে নিক। কিন্তু ভবেশ তাতে রাজী হয়নি। তার বাবা-মা আরো অরাজী ছিলেন।

তারপর শুরু হ'ল শত্রুভাবে ভজনার পালা। জিতেন বোস শাসালেন তিনি মামলা করবেন। তাঁর মেয়ের নামে অযথা অপবাদ দেওয়ার জন্য ফৌজদারী করবেন, খোরপোষের নালিশ আনবেন। কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত রাজদ্বারে আর গেলেন না। নিজেই রাজার ভূমিকা নিলেন। দত্তদের বাড়ির ছেলেরা খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে বোসেদের বাড়ির লোকজনের হাতে মার খেল। আর একদিন বাজারের ধার দিয়ে ফেরার সময় বোসেদের বাড়ির ছেলেদের মাথায় ইট পড়ল। এমনি চলল মাস দু'তিন। তারপর একদিন সন্ধ্যার পর নদীর ধারের নির্জন পথ থেকে দুই ভোজপুরী দারোয়ান ভবেশকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়ে তার শ্বশুর বাড়িতে হাজির করে দিল।

জিতেন বোস তাঁর অন্দর মহলের এক নির্জন ঘরে নিয়ে জামাইকে অনেক বোঝালেন। একবার পিঠে হাত বুলালেন, আর একবার

সশব্দে টেবিল চাপড়ালেন। ভাবখানা এই, কথা না শুনলে সে চাপড় ভবেশের গালেও পড়তে পারে। শাশুড়ী, পিস শাশুড়ীরা করলেন গুণজ্ঞানের চেষ্টা। চায়ের সঙ্গে কি একটা শিকড় বাটা যেন খাইয়ে ছিলেন তাঁরা। বার দুই বমি ক'রে ভবেশ সেই বশীকরণের উদ্যোগকে নিস্ফল ক'রে দিল। ভয় পেয়ে জিতেনবাবুই শেষ পর্যন্ত গাড়িতে ক'রে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন জামাইকে। সেই সময় এক টুকরো চিঠি হাতে এসে পৌছেছিল ভবেশের। 'ওঁদের কাণ্ড দেখে মরি। আমাকে ভুল বুঝো না। চিঠি লেখার ছলে স্পর্ধাকে ক্ষমা করো।'

কিন্তু শিকড় বাটা খেয়ে ভবেশের তখন মাথা গরম হয়ে গেছে। সে ভাবল এও আর এক ধরনের মন্ত্রতন্ত্র। বশীকরণের রকমফের। সে চিঠি ভবেশ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিল।

তারপরও দুই পরিবারের মধ্যে বহুকাল ধরে শত্রুতা চলেছিল। কিন্তু তার সাক্ষী হিসাবে ভবেশ আর যশোহরে উপস্থিত ছিল না। এম বি পাশ ক'রে সে বিলাত চয়ে যায়। তাই স্পেশালিস্ট হয়ে যখন ফিরে এল, তখন শহরের অদল বদল হয়েছে। বোসেদের সেই দাপট আর নেই। জিতেনবাবু মারা যাওয়ার পর সম্পত্তি নিয়ে ছেলেদের মধ্যে দেওয়ানী ফৌজদারী বেঁধেছে। দাদাদের সংসারে নলিনীর স্থান হয়নি। কোলের মেয়ে নিয়ে সে কলকাতায় চলে গেছে জীবিকার সন্ধানে।

আর সাফল্যের গৌরবে ভবেশের সেই প্রবঞ্চিত হওয়ার ইতিবৃত্ত চাপা পড়ে গেছে। বাড়ি গাড়ি যশ অর্থ, সুন্দরী স্ত্রী, স্বাস্থ্যবান সন্তান সবই পেয়েছে ভবেশ। নিজের ক্ষমতায় অর্জন করেছে। জীবনে কোথাও কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, অতৃপ্তি নেই, আশ্চর্য তবু সারারাত ঘুম এল না ভবেশের। একখানি ম্লান মুখ তার বিনিদ্র চোখের সামনে কেবলি ভেসে বেড়াতে লাগল। আর বহুকাল আগের সেই একটি ফুলশয্যার রাত। শিশিরে ভেজা পদ্মের মত একখানি মুখ।

এতদিন পরে ভবেশের মনে হলো নলিনীর হয়ত তত অপরাধ

ছিল না। কিন্তু বাবা-মা তখন মাথার ওপর। সে অবস্থায় ভবেশ কি-ই বা করতে পারত। এখনো নলিনী যা বলছে তা করবার সাধ্য অবশ্য ভবেশের নেই। আগে ছিলেন বাবা-মা এখন মানমর্যাদা। যে সমাজে সে বাস করে, তার রীতিনীতি আচার-আচরণ তাকে মানতেই হবে। যাতে ডলির আর বিশু যীশুর মুখ নীচু হয়, এমন কাজ সে কিছুতেই করতে পারে না।

এই উনিশ বছরের মধ্যে নলিনীর সঙ্গে আরো বার দুই ভবেশের দেখা হয়েছিল। বউবাজারে এক আত্মীয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল ভবেশ। গিয়ে দেখে নলিনী সেখানে এসেছে। শুধু চোখের দেখা। তারপর নলিনী বোধ হয় লজ্জা পেয়ে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। ভবেশও সরে পড়তে পারলে বাঁচে। কারণ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডলি তখন সঙ্গে আছে। দুজনের দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ডলির কাছে অবশ্য ভবেশ কিছুই গোপন করেনি। প্রথম জীবনের লজ্জাকর সেই ঘটনার কথা স্ত্রীকে সে বলেছিল। সেই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিয়েছিল নিজের জীবন কাহিনী থেকে সে অধ্যায়টি ভবেশ একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলেছে।

ডলি জবাব দিয়েছিল, 'মুছে ফেলাই তো উচিত। তাছাড়া তুমি আর কি করতে পারতে।'

তারপর আরো একবার আকস্মিকভাবে কলেজ হাসপাতালের আউট-ডোরে ভবেশের দেখা হয়েছিল নলিনীর সঙ্গে। ঠিক দেখা হওয়া নয়, নলিনী দূর থেকে তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। ভবেশ ডাঃ সান্যালের করিডরে দাঁড়িয়ে একটি পেশেণ্টের কেস নিয়ে আলোচনা করছিল। সান্যালই ভবেশকে ইশারা করে বলল, 'ওহে দত্ত, ভদ্রমহিলা বোধ হয় তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।'

চোখ ফেরাতেই ভবেশ দেখল, নলিনী দাঁড়িয়ে আছে। সান্যাল চলে যাওয়ার পর ভবেশ কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি এখানে।'

নলিনী বলল, 'থ্রোট ডিপার্টমেণ্টে এসেছিলাম।'

ভবেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার গলায় ?'

নলিনী একটু হেসেছিল, 'আমার গলায় আবার কি হবে। আমার একটি ছাত্রীর টনসিলিটিস, অপারেশন কেস। তাকে ভর্তি করাতে এসেছিলাম।'

'ভর্তি হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

ভবেশ আর জিজ্ঞেস করেনি ই টি এন ছেড়ে আই ডিপার্টমেণ্টের এদিকে নলিনী কোন কাজে এসেছিল।

একটু বাদে নলিনীই নিজে থেকে বিদায় নিল। 'যাই এবার। ভালো আছো? ছেলে দু'টি ভালো তো?'

ভবেশ বলেছিল 'হ্যাঁ।'

কিন্তু কুশল প্রশ্নের বিনিময়ে আর কোন কুশল প্রশ্নের কথাই ভবেশের মনে হয়নি। জিজ্ঞেস করেনি কোথায় আছে, কি করছে নলিনী। বরং ভবেশ যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল পাছে এই দেখা সাক্ষাৎ আর কারো চোখে পড়ে যায়। পাছে কোন বন্ধুর কৌতূহল মেটাতে হয়। অনেক সহকর্মীরই তো যাতায়াত আছে ভবেশের বাড়িতে। পাছে তারা কেউ গিয়ে ডলির কাছে এই সাক্ষাৎকারের গল্প করে।

ভবেশের দুর্বলতার কথা নলিনী কি টের পেয়েছিল? কে জানে?

ভোরে উঠে ডলি বলল, 'ব্যাপার কি, তোমার কি কাল ভালো ক'রে ঘুম হয়নি। চোখ দুটো লালচে হয়েছে যে।'

ভবেশ অনিদ্রার কথাটা জোর ক'রে অস্বীকার ক'রে বলল, 'না, না কাল তো খুব ঘুমিয়েছি ডলি। এত ঘুম শিগগির ঘুমোইনি।'

তারপর হাসপাতালের আউট-ডোর ডিউটিতে বেরোবার আগে ছেলে দুটিকে ডেকে আদর করল ভবেশ। বড়টির গাল টিপে দিল। ছোটটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেল কপালে। ভারি সুন্দর হয়েছে ওরা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, ফুটফুটে রঙ। রঙীন প্যাণ্ট আর হাফ শার্টে চমৎকার মানিয়েছে।

ডলি হেসে বলল, 'কি ব্যাপার আজ যে বাৎসল্যের বন্যা বইছে

একেবারে। কি ভাগ্য ওদের। আজ ওরা কার মুখ দেখে উঠেছিল।'

ভবেশ হেসে বলল, 'যার সুন্দর মুখ দেখে রোজ ওঠে।'

হাসপাতালে চেম্বারে রোগীদের চিকিৎসার আর বাড়িতে ফিরে স্নিগ্ধ পারিবারিক পরিবেশে স্ত্রীর সঙ্গে অবসর যাপনে সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে দিল ভবেশ। কিন্তু ঠিক আগের মত নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে কাটল না। দয়া ভিখারিণী একটি নারীর বিষাদ করুণ অস্পষ্ট একখানি মুখ ভবেশের মনের পটে বারবার ফুটে উঠতে লাগল।

নলিনীর মেয়ের বিয়ের দিন এগিয়ে এসেছে। তা আসুক। ভবেশ অমন অসঙ্গত প্রস্তাবে রাজী হ'তে পারে না। নিজের মান-সম্মানের কথা ভাবতে হবে, ভাবতে হবে পারিবারিক সুখ শান্তির কথা। অমন একটা অসমীচীন মিথ্যাচারে ভবেশ কি ক'রে রাজী হ'তে পারে? তা পারে না। তবে টাকা দিয়ে সাহায্য করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। আর সেই সাহায্যই বড় সাহায্য। মেয়ের বিয়েতে ভবেশের নামের চেয়ে তার টাকার দাম নিশ্চয়ই নলিনীর কাছে অনেক বেশি। নলিনী নিজেও হয়ত সে কথা জানে। শুধু লজ্জায় স্বীকার করতে পারেনি।

ভবেশ প্রথমে ভাবল, শ' পাঁচেক টাকার একটা চেক ডাকে পাঠিয়ে দেয় নলিনীকে।

বহু দুঃস্থ আত্মীয় বন্ধুর কন্যাদায়ে, এমন দান খয়রাত ভবেশকে মাঝে মাঝে করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে টাকার অঙ্কটা একটু বেশি হয়ে যাবে। তা না হয় হলোই। বিয়ের আগে নলিনী যদি অমন একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে না আসত তাহলে তো সে-ই সমস্ত কিছুর অধিকারিণী হোত।

কিন্তু চেক কাটতে গিয়ে ভবেশের মনে হলো চেকটা ডাকে না পাঠিয়ে একেবারে ওর হাতে দিয়ে এলে কেমন হয়। নলিনী অবাক হবে, নলিনী খুশী হবে। ওর মুখে হাসি কোনদিন দেখেনি ভবেশ। ভারি সাধ হলো আজ একবার দেখবে। আশঙ্কায় ভয়ে চোখ ভরা জল নিয়ে যে মেয়ে বাসরঘরে এসেছিল, এই যৌবন-সীমান্তে তার

মুখে এক ফোঁটা হাসি কেমন মানাবে ভাবতে চেষ্টা করল ভবেশ।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন ধর্মতলার চেম্বারে না গিয়ে লিণ্ডসে স্ট্রিটের এক পরিচিত অভিজাত ড্রাগিস্টের দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে দোকানে ঢুকে সহকারী সুরজিৎকে ভবেশ ফোন ক'রে দিল। ভবেশ আজ জরুরী কাজে আটকা পড়েছে। তাই চেম্বারে যেতে পারবে না। সুরজিৎই যেন রোগীদের অ্যাটেণ্ড করে।

তারপর উত্তরমুখে ছুটে চলল ভবেশের স্টুডিবেকার। বহুদিন বাদে ছুটি নিয়েছে, ছুটি পেয়েছে শহরের কর্মব্যস্ত ভবেশ ডাক্তার। এমন অহেতুক নিরুদ্দেশ যাত্রার আনন্দ যেন তার ভাগ্যে শিগগির জোটেনি।

মোটরযানের পক্ষে সুগম নয় এমন অনেক আঁকা-বাঁকা সঙ্কীর্ণ-সর্পিল পথ পেরিয়ে ভবেশের গাড়ি পুরোনো একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

আশে পাশে শহরের চেয়ে গ্রামের পরিবেশই বেশি। রাস্তার ওপারে খানিকটা পোড়ো জমি। তার লাগা ছোট পানাপুকুরটিতে গুটি দুয়েক সাপলা জলের ওপর মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে। একটি ফুটছে আর একটি ফোটেনি। আরো পশ্চিমে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটি নতুন বাড়ি উঠছে। মজুরের দল কাজ করে চলেছে। আকাশে আজ মেঘ নেই। আছে রক্তিম গোধূলির রঙ।

গাড়ী থেকে নেমে একটু ইতস্তত ক'রে রুদ্ধ দরজার কড়া নাড়ল ভবেশ। সঙ্গে সঙ্গে দরজার খিল খুলে আঠার-উনিশ বছরের একটি মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। শ্যামবর্ণা, তন্বী সুঠাম চেহারা। নলিনীর মতই টানা নাক, কালো বড় বড় চোখ। সেই চোখ অভিজাত ভবেশ ডাক্তারের বিস্মিত কৌতূহলের উদ্রেক করেছে। কি জিজ্ঞাসা করবে ওকে একটু যেন ভাবতে হলো ভবেশকে। সন্তানের বয়সী এই মেয়েটির সামনে নিজের পরিত্যক্তা স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাকতে কেমন একটু লজ্জা বোধ করলে ভবেশ, তারপর সঙ্কোচের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল, 'নলিনী আছে।'

মেয়েটি স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, 'না। মা তো এখনো স্কুল থেকে ফেরেননি। আপনি আসুন ঘরে বসুন এসে। তাঁর ফিরতে বেশি দেরি হবে না।'

ভবেশ ভিতরে এসে ঢুকল। পরিপাটি ক'রে গুছানো ছোট্ট সুন্দর একখানি ঘর। পুরোনো জীর্ণতার ওপর পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ পড়েছে। জানালায় নীলরঙের পর্দা। এমব্রয়ডারি করা সাদা ঢাকনিতে ঢাকা ছোট একটি টেবিল। তার ওপর কিছু দর্শন ইতিহাসের পাঠ্য বই। দু'খানি চেয়ার। একখানা সামনে একখানা পাশে। দেয়াল ঘেঁষে একটি তক্তপোশ, মাথার কাছে বইয়ে ভরতি একটি শেলফ তার ওপর ছোট একটি সবুজ ফুলদানী, তাতে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকা!

প্রসন্নতায় মন ভরে উঠল ভবেশের। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নামই বুঝি গীতা?'

'হ্যাঁ।' মেয়েটি স্মিতমুখে জবাব দিল।

'আমার নাম ভবেশচন্দ্র দত্ত।'

'বাবা!'

অস্ফুটস্বরে কথাটি বলে নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠল মেয়েটি। তারপর অপলকে একটুকাল ভবেশের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময় কৌতূহল, অভিযোগ অভিমানে মেশা সে এক অপরূপ দৃষ্টি, তারপর কি তার মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভবেশের জুতো ছুঁয়ে প্রণাম করল গীতা।

ভবেশ একটু যেন বিমূঢ় হ'য়ে রইল। তারপর আস্তে আলগোছে গীতার মাথায় হাত রেখে বলল, 'থাক থাক।'

নিজের ছেলেদের মুখে এ সম্বোধন তো ভবেশ রোজ শোনে। কিন্তু গীতার মুখের এই লজ্জিত অস্ফুট শব্দটি ভারি অশ্রুতপূর্ব মনে হলো ভবেশের। এক অনাস্বাদিত অনুভূতিতে তার মন ভরে উঠল। ভবেশ ভাবল এমন পরম মিথ্যা একটি সম্বোধনে হঠাৎ এত বড় সত্য হয়ে উঠল কি ক'রে। কই গীতাকে দেখে, ওর মুখের ডাক শুনে তো মোটেই মনে হচ্ছে না তার সঙ্গে ভবেশের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই,

বরং পরম আত্মীয় বলেই তো মনে হ'চ্ছে ওকে। তবে সত্যিকারের আত্মীয়তা মানুষের রক্তের মধ্যে নয়, আসল সম্পর্ক মানুষের ভাবের মধ্যে, অনুভবের মধ্যে!

'আপনি ঘামছেন। ঘরটা বড় গরম।' বলে গীতা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে শুরু করল।

ভবেশ এবার আর বাধা দিল না। মৃদু হেসে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল।

ডাক্তার হিসেবে এই বয়সী কত তরুণী মেয়ের সান্নিধ্যেই না এর আগে এসেছে ভবেশ। কিন্তু কই এমন বাৎসল্যের ভাব তো কাউকে দেখে এর আগে জাগেনি। মনে মনে কর্তব্য ঠিক করে ফেলল ভবেশ। নলিনীর সব প্রার্থনাই আজ সে পূরণ করবে। একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে তার মন এক পরম প্রসন্নতায় ভরে গেল। এই স্নিগ্ধ সেবা-নিপুণা লাবণ্যময়ী মেয়েটি পিতৃপরিচয় পেয়ে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করুক, একটি ভদ্র পরিবারে মর্যাদাময়ী বধূর আসন পেয়ে ওর জীবন সার্থক হয়ে উঠুক। তার জন্যে যত অসুবিধে অশান্তি ভোগ করতে হয় ভবেশ করবে।

সামাজিক মান সম্মান তুচ্ছ করবার নয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় মানুষের হৃদয়। নিজের মধ্যে এক পরম উদার হৃদয়বান পুরুষের অস্তিত্বের সাড়া পেয়ে ভবেশ গৌরব বোধ করল। তারপর খুঁটে খুঁটে মা আর মেয়ের জীবন সংগ্রামের অনেক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করল ভবেশ। বহু কষ্টে আর কৃচ্ছ্রতার মধ্যেই মেয়েকে মানুষ করেছে নলিনী। এখনো দুটো টুইশন ক'রে গীতাকে নিজের পড়ার খরচ চালাতে হয়। শুধু নলিনীর রোজগারে এ সব ব্যয়ের সঙ্কুলান হয় না। খানিক শুনে এবং অনেকখানি আন্দাজ ক'রে ভবেশের মন সহানুভূতিতে ভরে উঠল।

স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতার মধ্যে গীতাকে যদি বড় করে তুলত ভবেশ ডাঃ নাগের মেয়ে রুচিরা ওর কাছে দাঁড়াতে পারত নাকি! গীতার হাতে গলায় কোথাও কোন অলঙ্কার নেই। ধানী রঙের সাধারণ একখানি তাঁতের শাড়ি ঘুরিয়ে পরা। তাতেই কি চমৎকার

মানিয়েছে। কি অপূর্ব্ব সুন্দরই না দেখাচ্ছে এই নিরাভরণা মেয়েটিকে।
দোরের কাছে জুতোর শব্দ হলো। সিঁড়িতে পা রেখে নলিনী একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পর অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি!'
নলিনীর পরনে সেই খয়েরী পাড়ের সাদা খোলের শাড়ি, হাতে একটি পুরোনো ছাতা, আর এক হাতে কতগুলি খাতা।
ভবেশ একটু হেসে বলল, 'ভাবতে পারনি যে খুঁজে বের করব? মেয়ের বিয়েটা চুপি চুপি একা একাই সেরে ফেলবে ভেবেছিলে বুঝি?'

একথার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী মেয়ের দিকে তাকাল, 'গীতু, তুমি একবার ও ঘরে যাও তো মা। চা ক'রে নিয়ে এসো।'
আরক্ত হয়ে উঠল গীতার মুখ, মৃদু হাসি গোপন করতে করতে দ্রুতপায়ে সে পাশের ঘরে চলে গেল।
মৃদু হেসে প্রথম তারুণ্যের সেই মধুর লজ্জা উপভোগ করল ভবেশ। তারপর নলিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মেয়েকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলে কেন। আমি কি কোন বেফাঁস কথা বলেছি?'
নলিনী বলল, 'না।'
'তবে?'
নলিনী বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার নিজের কিছু কথা আছে।'
ভবেশের সঙ্গে নলিনীর নিজের কথা! কি কথা বলবে নলিনী! এই উনিশ বছর ধরে যত কথা জমেছে তার কতটুকুই বা বলে প্রকাশ করতে পারবে?
ভবেশ নলিনীর দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'কি বলবে বল।'
নলিনী বলল, 'নির্মলকে আজ সবই বলে এলাম।'
ভবেশ বলল, 'নির্মল কে?'
নলিনী একটু হাসল, 'অমন করে তোমাকে ভ্রূ-কোঁচকাতে হবে না। নির্মল আমার ছেলের মত। গীতা যে কলেজে পড়ে সেখানকার লেকচারার। ওর সঙ্গেই গীতার সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে।'

ভবেশ বলল, 'তাই বল। আগে থেকেই ওদের মধ্যে জানা শোনা হয়েছিল নাকি!'
নলিনী বলল, 'তা হয়েছিল। মাইনে শ' খানেক টাকার বেশী পায় না। তবে প্রাইভেট টুইশনি করে, নোট লিখে কোন রকমে পুষিয়ে নেয়। বেশ ভালো চরিত্রবান ছেলে।' তারপর নলিনী একটু থেমে বলল, 'তোমার চেম্বার থেকে ফিরে এসে এই সাতদিন ধরে আমার ভাবনার আর সীমা ছিল না। মাথা ঠিক করে ক্লাস করতে পারতাম না, তাদের খাতা দেখতে পারতাম না, ঘরের কাজকর্মে পর্যন্ত ভুল হয়ে যেত। জীবন ভরে এত দুঃখ কষ্ট গেছে, কই আমার মন এমন অস্থির তো কোন দিন হয়নি।'
ভবেশ বলল, 'থামলে কেন নলিনী, বল।'
নলিনী বলতে লাগল, 'কিন্তু অস্থির হলে তো চলবে না আমার। আমাকে যে কর্তব্য ঠিক করে ফেলতেই হবে। ওদের বিয়ের দিন যে এগিয়ে আসছে। একবার ভাবলাম গীতাকেই আগে বলি। ও সব খুলে বলবে নির্মলকে। কিন্তু পরে মনে হলো ও কি পারবে? আমার গীতার তো কোন অপরাধ নেই। এমন একটা শক্ত কাজের ভার কেন ওর মাথার ওপর তুলে দেব? তাই নিজের লজ্জার কথা নিজের মুখেই বললাম। সব খুলে বললাম নির্মলকে।'
ভবেশ চমকে উঠে বলল, 'তুমি কি বলেছ নলিনী, কি বলেছ তাকে?'
নলিনী বলল, 'যা সত্যি তাই বলেছি। বললাম নির্মল, তোমরা এতদিন যা জানতে তা মিথ্যে, গীতা ডাঃ দত্তের মেয়ে নয়। ও আমার।'
ট্রেতে ক'রে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসছিল গীতা। দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল, অস্ফুট স্বরে বলল, 'মা'।
নলিনী মেয়ের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল, 'এসো গীতু ঘরে এসো। সবাইকে চা দাও।'
কিন্তু গীতা দুজনের দিকে একবার ক'রে তাকিয়ে চায়ের ট্রেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ফের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবারো

বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে গীতা। কিন্তু তখনকার লজ্জা আর এখনকার লজ্জায় তফাৎ অনেক।
ভবেশ আবেগভরা গলায় বলে উঠল, 'কেন এমন সর্বনাশ করলে নলিনী। আমি যে, আমি যে—।'
নলিনী বলল, 'আমি জানি তুমি কি জন্যে এসেছিলে। কিন্তু সত্য গোপন করে অল্প-বয়সে নিজের যে সর্বনাশ করেছি কোন লোভেই গীতার তেমন সর্বনাশ যেন না করি। নির্মল দু'একদিন সময় নিয়েছে। জানিনে মেয়ের ভাগ্যে কি আছে। কিন্তু যাই থাক, ওর ঘর-সংসারের ভিত চোরাবালি দিয়ে কোনদিন গেঁথে তুলতে দেব না।'
ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। কিন্তু কেউ গিয়ে স্থইচ টিপে আলো জ্বালবার প্রয়োজন বোধ করল না, ভবেশ বাইরের দিকে তাকাল। পুকুরের জলেই সেই একজোড়া ফুল কোথায় মিলিয়ে গেছে। নারকেল গাছগুলির আড়ালে সেই অসম্পূর্ণ নতুন বাড়িটাকে এখন মনে হচ্ছে কদাকার একটা ভূতের মত।

আস্তে আস্তে উঠে পড়ল ভবেশ। বেরোতে বেরোতে বলল, 'যাই নলিনী।'
নলিনী যন্ত্রের মত আবৃত্তি করল, 'আর একদিন এসো।'
ভবেশ নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে উঠল, যদি কাজ কামাই করে সে ফের আর একদিন এদিকে আসেই, আর নলিনী বাড়িতে না থাকে গীতা কি আজকের মত ওর সামনে এসে দাঁড়াবে, পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে, তারপর পাশে বসে হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকবে? তা বোধ হয় কখনো আর করবে না। ওর মুখের পিতৃ সম্বোধন দ্বিতীয়বার ভবেশের আর শোনা হবে না।

ডিসপেনসারিটি যে অনেক দিনের পুরনো তা ঘরখানির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। লম্বা লম্বা কয়েকটা ওষুধের আলমারি, তার সামনে ছোট্ট একটা টেবিল, খানকয়েক হাতলওয়ালা পুরনো ধরনের চেয়ার। কোন ফার্নিচারেই পালিশের বালাই নেই। রঙ একেবারে কালো হয়ে গেছে। কিন্তু পালিশ না থাক না-ই থাকল, ছারপোকা যে অগুনতি আছে তাতেই রানুর আপত্তি। এই পনের বিশ মিনিটের মধ্যেই দু'দুবার চেয়ার বদলেছে রানু, কিন্তু কোনটিই সুখাসন হয়ে ওঠেনি। আচ্ছা, ডাক্তারবাবু এত রোজগার করেন, এই চেয়ারগুলি বদলে ফেলতে পারেন না? গদি আঁটা তাঁর নিজের বসবার চেয়ারটির দশাই বা কি। বুড়ো ডাক্তারের বোধ হয় এই ফার্নিচারগুলির ওপর মায়া জন্মে গেছে। কিছুই তিনি বদলাবেন না। শুধু ফার্নিচার না, এই ডিসপেনসারিটির সবই পুরনো। ডাক্তার পুরনো, কম্পাউণ্ডার পুরনো, চাকর পুরনো। দাইটি পর্যন্ত বুড়ি থুড়থুড়ি। ওর বয়সও ষাট পঁয়ষট্টির কম হবে না। কাঠের পার্টিশন দেওয়া ছোট্ট কেবিনটির মধ্যে সারদা দাই একটি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সেই থেকে বক বক করছে। ডাক্তারবাবু এই বিকেলবেলায় থাকেন না তা রানু জানে, কিন্তু কম্পাউণ্ডারটিও যে কোথায় উধাও হয়েছে তার ঠিক নেই। অথচ কলেজে যাওয়ার সময় রানু এতবার করে বলে গেল "মা'র মিকশ্চারটা তৈরি করে রাখবেন আমি বিকেলে ফেরার পথে নিয়ে যাব" তা তাঁর গ্রাহ্যই হলো না। এই ডিসপেনসারির ব্যবস্থাই এইরকম। এতদিনের পুরনো কাস্টমার রানুরা, কিন্তু তাদের সঙ্গে মোটেই ভদ্র ব্যবহার করেন না ডাক্তার কম্পাউণ্ডার। কোনবারই এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বসে না থেকে এখান থেকে ওষুধ নিয়ে যেতে পারেনি রানু। অথচ বাবা মা'র ভাবভঙ্গি

রানু যদি না হতো

দেখলে মনে হয় এই ডাক্তার এই ডিসপেনসারি ছাড়া শহরে আর কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। বাড়ির যে-কারো অসুখে, যে-কোন অসুখে, তাঁরা এই বুড়ো ডাক্তার শ্রীপতি দত্তের শরণ নেবেন। কোথায় এই শ্যামপুকুর আর কোথায় রানুদের বাসা রামকান্ত বোস স্ট্রীট। এতখানি রাস্তা পার হয়ে এই ডিসপেনসারিতে রানুর বাবা মা চিকিৎসা করাতে আসবেন তবু কাছাকাছি কোন ডাক্তারকে দেখাবেন্ না। মা ক'দিন যাবৎ জ্বরে ভুগছেন। ডাক্তারবাবু একবার দেখে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছেন। কলেজে যাওয়ার পথে তাঁকে রিপোর্ট দিয়ে গেছে রানু। তিনি বলেছেন, আগের ওষুধটাই চলবে। তাই ফেরার পথে রানু মিকশ্চারটা নিয়ে যাবে বলে এসেছে। কিন্তু কোথায় কম্পাউণ্ডার, কোথায়ই বা ওষুধ। শিশিটা ফটিকবাবুর টেবিলে ঠিক আগের মতই খালি পড়ে আছে। দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল রানুর। কেন, তারা কি পয়সা দিয়ে ওষুধ কেনে না? কিছু টাকা মাঝে মাঝে বাকি পড়লেও দু'এক মাসের মধ্যেই তারা শোধ দেয়। এত অবজ্ঞা অবহেলা কেন তাদের ওপর। বাবাকে এবার সে পরিষ্কার বলে দেবে, "ও-ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনতে হয় তুমি আন গিয়ে, আমি আর পারব না।"

সত্যি কলেজ থেকে ফিরে এসে এমন বিকেলটা নষ্ট করতে কার ইচ্ছা হয়? বিশেষ করে এই ফাল্গুনের বিকেল? কথা ছিল গোঁসাইপাড়া লেনে আজ রানু তার বন্ধু হেনাদের বাড়ি হয়ে যাবে। হেনার মাসতুতো ভাই সুনীলদা আসবে সেখানে। নামটা মনে পড়তেই মুখে একটু হাসি ফুটল রানুর। সুনীলকে আজকাল আর সে সুনীলদা বলে ডাকে না। মুখে কিছু বলে না, মনে মনে নাম ধরে ডাকে। অন্য সকলের সামনে এখনো অবশ্য আপনিই বলে, কিন্তু আড়ালে তারা দু'জনে দু'জনের তুমি। যদিও সুনীলের বয়স তেইশ, আর রানুর সতের, যদিও সুনীল এক বছর আগে এম- এ, পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছে, আর রানু এখনো মাত্র সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী, তবু বিদ্যা আর বয়সের সব ব্যবধান তারা মাত্র বছর দেড়েকের আলাপ পরিচয়ের পরই পার হয়ে এসেছে।

ঢং করে দেয়ালের ঘড়িটায় একটা শব্দ হলো। সাড়ে পাঁচটা। ঈস, পাঁচটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। অবশ্য যতক্ষণ রান্থ না যাবে, স্থনীল তার জন্যে অপেক্ষা করেই থাকবে, তবু ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে। যে ছেলে ভালোবাসে তার সঙ্গেও সময়টা ঠিকই রাখতে হয়। আজকে অবশ্য বেশী দেরি করত না রান্থ। মা'র অস্থখ, সংসারের কাজকর্ম গুছোতে হবে, ভাই বোনগুলিকে দেখতে হবে, দেরি করবে কি করে। কিন্তু দেরি না করলেও দু'-চার মিনিটের জন্যে দেখা তো হতো, দু'একটা কথা তো হতো। কিন্তু বুড়ো ফটিক কম্পাউণ্ডার সব মাটি করে দিল।

"সারদা দি!" রান্থ এবার অধীর হয়ে বুড়ি দাইকে ডেকে উঠল।

"কি বলছ।" পার্টিশনের আড়াল থেকে জবাব দিল সারদা।

"আচ্ছা, ফটিকবাবু কি আজ আর ফিরবেন না?"

সারদা বলল, "একটু সবুর করো দিদি, এই এল বলে।"

রান্থ অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, "তুমিতো সেই কখন থেকে বলছ এল বলে, এল বলে। আমি আর কতক্ষণ বসে থাকবো।"

সারদা হেসে বলল, "যা বলেছ। তোমার বয়সে একা একা বেশি-ক্ষণ বসে থাকা যায় না। এসো, ভিতরে এসো।"

রান্থ রাগ করে উঠে গিয়ে কামরার দোরটা ঠেলে দিয়ে বলল, "কোথায় গেছে সত্যি করে বল।"

সারদা বলল, "বলে তো গেছে, ক'টা ইন্‌জেকশন আনতে চললুম। আসবার পথে বোধহয় বাসায় যাবে। চা-টা খেয়ে আসবে। বউয়ের কথা মনে পড়েছে।"

বিরক্ত হয়ে রান্থ ফিরে যাচ্ছিল, সারদা উঠে এসে হাত ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে টুলের ওপর বসিয়ে দিল।

একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠল রান্থ। ডিসপেনসারির দাইয়ের এতটা ঘনিষ্ঠতা সে পছন্দ করে না। কিন্তু কিছু বলবার জো নেই। সারদা দাই শুধু তাকে হতে দেখেনি হওয়ার সময় সাহায্য করেছে। ঠাকুরমা দিদিমার বয়সী। মাথার চুল বেশির ভাগই পাকা। ঘাড়ের

কাছে বড় একটা খোঁপা করে জড়িয়ে রেখেছে। বেশ মোটাসোটা মাংসল চেহারা। গায়ে সাদা একটা জামা। তাকে ব্লাউজ বললেও চলে, আবার পুরুষের ফতুয়াও বলা যায়। পরনে কালো ফিতে-পেড়ে শাড়ি। সারদা বালবিধবা। ছেলেপুলে কিছু নেই। নিকট আত্মীয়-স্বজনও না।

রাহু টুলের ওপর বসতেই, তার পাশের স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বছর চল্লিশেক হবে বয়স। নিম্ন শ্রেণীর গরিবের ঘরের বউ। আধ ময়লা শাড়িখানা দেখলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু মাগো, কি বিশ্রীই না হয়েছে। এই অবস্থায় বেরিয়েছে কি করে। লজ্জা-টজ্জাও নেই।

স্ত্রীলোকটি বলল "আমি তাহলে যাই দিদি।"

সারদা বলল, "হ্যাঁ, এসো। এখনো দেরি আছে। ও ব্যথা সে ব্যথা নয়। পুরনো পোয়াতি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন।"

স্ত্রীলোকটি এবার হাসল, "ঘাবড়ে আর কি করব দিদি।" পিছনের ছোট দরজা দিয়ে সে এবার বেরিয়ে গেল।

সারদা বলল, "অমন করে কি দেখছ। এ অবস্থা তোমারও একদিন হবে।"

রাহু আরক্ত মুখে বলল, "যাও, ও-সব বাজে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"

সারদা হেসে বলল, "বাজে নয় দিদি বাজে নয়। আর বড়জোর দুটি একটি বছর, তারপর তোমাকেও অমনি সুখের বোঝা নিয়ে আসতে হবে এখানে।"

রাহু রাগ করে উঠে যাচ্ছিল, সারদা তাকে ফের টেনে বসাল। তারপর হেসে বলল, "অবশ্য এখানে না এসেও পারবে। বুড়ি দাইয়ের কাছে আর আসবে কেন, বড় বড় হাসপাতালেই যেতে পারবে। তোমার মা তো এখন খালাস হতে হাসপাতালেই যায়। তোমার বারে কিন্তু যা করবার আমরাই করেছিলাম।"

রাহু বলল, "তাতো অনেকদিন শুনেছি।"

সারদা রাহুর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল, "ঘোড়ার ডিম শুনেছ।

আসল কথার কিছুই শোননি। সে কি কম কেলেঙ্কারি। বাপরে বাপ। মনে হলে এখনো আমার গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

এতক্ষণে রানুর কৌতূহল হল। সারদার দিকে আর একটু সরে এসে বলল, "কী ব্যাপার বল তো? কী হয়েছিল?"

সারদা বলল, "শুনবে? আচ্ছা শোন। এখন আর শুনতে বাধা কি। এখনতো সবই বুঝতে শিখেছ।"

রানু বলল, "আঃ অত ভূমিকা করছ কেন সারদাদি। যা বলবার বলে ফেল। সত্যি সত্যি হয়েছিল কি।"

সারদা পরম কৌতুকের স্বরে বলল, "কি হয়েছিল? কিছুই আর হওয়ার জো ছিল না দিদি। যা একখানা কাণ্ড বাধিয়েছিল তোমার বাপ মা, তাতে তোমাকে আর এ পৃথিবীতে আসতে হতো না।"

রানু ভ্রূ কুঁচকে বলল, "তার মানে?"

সারদা বলল, "মানে আবার কি। মানে বুঝি কিছুই বোঝনি? খুব ভাল করেই বুঝেছ। কে কতটুকু বোঝে না বোঝে মুখ দেখলেই আমরা টের পাই।"

রানু ব্যাকুল হয়ে বলল, "না-না, গোড়া থেকে সব খুলে বল দিদি। সত্যি বলছি, আমার কাছে সব হেঁয়ালির মত লাগছে।"

সারদা হাসল, "হেঁয়ালিতো বটেই। মানুষের জন্ম হেঁয়ালি, মানুষ নিজে একটা হেঁয়ালি, দুনিয়া সুদ্ধ তো হেঁয়ালিরই মেলা।"

একটু থেমে সারদা বলল, "তোমার বাপের নাম তো হেমাঙ্গ বোস আর মা'র নাম কমলা, তাই না? দেখ কি রকম মনে রেখেছি।"

রানু একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "নাম দুটো মনে রাখা এমন কি আর শক্ত। তাছাড়া অসুখ বিসুখ হলে ওঁরাতো তোমাদের এখানেই আসেন।"

সারদা তেমনি তরল স্বরে বলল, "কেবল নাম কেন, কীর্তি-কাহিনী সব কথাই মনে আছে! তোমার কত বয়স হলো, সতের আঠের, তাই না?"

"আঠের এখনো হয়নি।"

সারদা বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সতেরই হবে। প্রথম দিনটির কথা বেশ

মনে আছে আমার। ঠিক এই রকম সময়। কি এর চেয়ে আর একটু বেশী বেলা গেছে। তখন তোমাদের বাসা ছিল শ্যামবাজার স্ট্রীটে। তোমাদের মানে তোমার ঠাকুরদার। ষাটের কাছাকাছি বয়স। তবু বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা। ভদ্রলোক প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে এই ডিসপেনসারিতে ঢুকলেন। ঘর ভরা রোগী। তবু ডাক্তারবাবু সব ফেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন 'কি ব্যাপার। কি হয়েছে আপনার?' তিনি বললেন 'সর্বনাশ হতে বসেছে। আমার বউমার খুব অসুখ, আপনি এখুনি চলুন।"
সারদা একটু থেমে রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।
রানু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "হাসছ কেন?"
সারদা বলল, "এখন হাসছি। তখন কি আর হাসবার জো ছিল? ডাক্তারবাবু তোমার ঠাকুরদাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে ব্যাপারটা বলুন আগে।' তখন তোমার ঠাকুরদা বললেন, 'তোমার মা তিন মাসের পোয়াতি। কিন্তু হঠাৎ ব্লিডিং হচ্ছে, আর পেটে অস্বাভাবিক যন্ত্রণা।' ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, 'চল সারদা দেখে আসি, তুমিতো এসব ব্যাপারে আমার চেয়েও ওস্তাদ।' এইতো এখান থেকে ওখানে। হেঁটেই গেলাম আমরা। গিয়ে দেখি তোমার মা যন্ত্রণায় মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। তোমার ঠাকুরমা কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তোমার মাকে দেখে আমার ভারি মায়া হলো। আহা বাচ্চা মেয়ে, ঠিক তোমার এই বয়স, কি একটু কমও হতে পারে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখেই আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো। ডাক্তারবাবুকে বললাম 'ব্যাপার সহজ নয়।' ডাক্তারবাবু গম্ভীর মুখে বললেন 'হুঁ'।"
পানের কৌটো থেকে একটা পান বার করে মুখে পুরল সারদা, খানিকটা তামাকপাতা সেই সঙ্গে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চিবুতে লাগল।
রানু অধীর হয়ে বলল, "তারপর?"
সারদা বলল, "তারপর আর বেশী কিছু শুনে তোমার কাজ নেই দিদি। ডাক্তারবাবু প্রায় ধমকে উঠলেন, 'এমন হলো কেন? এমন হওয়ার তো কথা নয়। তোমার ঠাকুরদা ঠাকুরমা বললেন,

'আমরাতো কিছুই জানিনে ডাক্তারবাবু।' তিনি বলিলেন, 'আপনার ছেলে নিশ্চয়ই সব জানে, ডাকুন তাকে।' কিন্তু তোমার বাবাকে কোথাও পাওয়া গেল না। তখনই তখনই ডিসপেনসারি থেকে ঔষধ আনিয়ে দেওয়া হলো। তোমার মাকে খানিকটা সুস্থ করে আমরা বেরিয়ে এলাম। পরদিন ফের রোগী দেখতে গিয়ে ডাক্তারবাবু তোমার বাপকে পাকড়ে ধরলেন। 'কি করেছ সত্যি করে বল'।"

রানু রুদ্ধশ্বাসে বলল, "তারপর?"

সারদা মৃদু হেসে বলল, "তেইশ চব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলে। কিন্তু ডাক্তারবাবুর ধমকে ভয়ে একেবারে কেঁচো। ডাক্তারবাবু সহজ পাত্র নন। সব কথা তার কাছ থেকে বের করে নিয়েছিলেন। আমাদের কাছে আসবার আগে তোমার বাবা আর এক গুণধর ডাক্তারের ওষুধ খাইয়েছিল তোমার মাকে। তাও কি একবার? তিন তিনবার। একদিন এই ডিসপেনসারির মধ্যেই ডাক্তারবাবু আর আমি দুজনে মিলে তোমার বাবাকে ফের ধরে বসলাম, 'কেন এমন কর্ম করতে গিয়েছিলে বাপু বল। এই তোমাদের প্রথম সন্তান।' ছোকরা আমতা আমতা করে কত কথাই না বললো। সবে বি এ পাশ করে বেরিয়েছে। চাকরি বাকরি হয়নি, ছেলেপুলে হলে খাওয়াবে কি। তাছাড়া এত অল্প বয়সে ওসব ঝামেলা বাড়ুক সে আর তার স্ত্রী কেউ তা চায়নি। তাদের জীবনের আরো অনেক সাধ আহ্লাদ আছে। বউকে সে পড়াবে পাশ পরীক্ষা দেওয়াবে—"

রানু উঠে দাঁড়াল।

সারদা বলল, "চললে? তা দিদি বড় প্রাণের জোর তোমার। যা দশা হয়েছিল তাতে কেউ আশা করিনি তুমি তাজা অবস্থায় পেট থেকে পড়বে। মেয়ে মানুষের জান, তাই বেঁচেছ। ছেলে হলে বোধ হয় আর রক্ষে পেতে না।"

রানু কোন কথা না বলে দোর ঠেলে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, সারদা বলল, "এসব কথা তোমাকে যে বললাম, তা যেন আবার তোমার বাপ-মাকে বলে দিয়ো না। লজ্জা পাবে। আপদ-বিপদ সব চুকে

গেছে তাই আজ গল্পটা বললাম। বেঁচে থাক, সুখে থাক। আহাহা সন্তান যে কি জিনিস—"
কথা শেষ না করে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সারদা।
রান্থ কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দেখে কম্পাউণ্ডার ফটিকবাবু তাঁর ছোট্ট ডেসকটির ধারে গিয়ে বসেছেন, রান্থকে দেখে ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন, "এই নাও দিদি তোমার মার ওষুধ। দেরি দেখে খুব রেগে গিয়েছিলে বুঝি ?"
দাগকাটা মিক্‌শ্চারের শিশিটা রান্থর হাতে তুলে দিয়ে ফটিকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছে তোমার মা ?"
রান্থ সংক্ষেপে জবাব দিল, "ভালো।"
তারপর ডাক্তারবাবুর টেবিলের ওপর থেকে বইখাতাগুলি তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে প্রথমেই তার মনে হলো, এই পৃথিবীতে সে জোর করে এসেছে। তার আসবার কোন কথা ছিল না। তাকে কেউ চায়নি। সে যাতে না আসে তার জন্যেই সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কি হতো যদি সে না হতো, যদি সে না আসত।
ট্রাম বাসে অফিস ফেরত কেরানিদের ভিড়। তার বাবাও কেরানি। ট্রাম বাসে উঠল না রান্থ। হেঁটে হেঁটে বাড়ির দিকে চলল। ভারি অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত কথা। পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব একান্ত আকস্মিক। সে না হতেও পারত, সে না আসতেও পারত।
গোঁসাইপাড়া লেন কখন ছাড়িয়ে এল রান্থ। সুনীলের খোঁজে আজ আর হেনাদের বাড়িতে তার যেতে ইচ্ছা করল না। গেলে অবশ্য এখনো দেখা হয়। সুনীল তার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে বসে থাকবে। থাকুক, কি হবে দেখা ক'রে। রান্থ যদি না হতো, তাহলে কেইবা দেখা করতে যেত। এ পৃথিবীতে তার না আসবার, না থাকবার কথাইতো সব চেয়ে বেশী ছিল। এই যে সন্ধ্যাবেলায় এমন আলোয়-ভরা লোকজন-ভরা শহরের পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে এই চলবার কোন কথা ছিল না।
ঠিক ইচ্ছা করে নয়, নেহাৎই অভ্যাসের বসে নিজেদের গলিতে ঢুকে

পড়ল, ঠিক অন্যদিনের মতই বাড়ির সামনে এসে রুদ্ধ দরজার কড়া নাড়ল। কিন্তু আজকের রানু আর অন্যদিনের রানু সম্পূর্ণ আলাদা। আজকের রানু আর পুরোপুরি এ পৃথিবীর মেয়ে নয়, এমন এক জগতের যেখানে কেউ নেই, কিছু নেই।

কড়া নাড়ার শব্দে একটি কিশোরী মেয়ে এসে দোর খুলে দিল। রানুর বোন বুলু। বছর চোদ্দ বয়স, দেখে অতটা মনে হয় না। রানুর মত অমন স্বাস্থ্যবতী নয়, সুন্দরীও নয়। দেখতে যেমন কালো তেমনই রোগা।

বুলু সাগ্রহে বলল, "দিদি এলি? এত দেরি করলি যে?" রানু রুক্ষ স্বরে বলল, "দেখছিস না হাতে ওষুধ। দেরি করেছি কি সাধে! ডিসপেনসারিতে গিয়েছিলাম।"

বুলু বলল, "ও। মার জ্বর অনেক কমেছে দিদি, কিন্তু ভারি দুর্বল। মাথা তুলতে পারছে না।"

রানু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, নে ওষুধটা এবার খাইয়ে দে গিয়ে।"

বুলু একটুকাল অবাক হয়ে বলল, "কি হয়েছে তোর? একেবারে ঝগড়া মুখে করে মিলিটারি মেজাজ নিয়ে এসেছিল।"

রানু বলল, "তোকে আর বকবক করতে হবে না। যা বললুম তাই কর গিয়ে।"

বুলু আর কোন কথা না বলে সামনে থেকে সরে গেল। ভিতরের দিকে আর একটু যেতেই রানুর ছোট দু'টি ভাই বঙ্কু রঙ্কু এগিয়ে এল। দুজনের খোলা গা। পরনে হাফপ্যাণ্ট। রোগাটে চেহারা একজনের বয়স বছর দশ, আর একজনের সাত।

বঙ্কু বলিল, "দিদি আমার খাতা পেনসিল এনেছ?"

রানু ঝাঁঝালো ধমকের সুরে বলল, "খাতা পেনসিল আনবার কর্তা কি আমি? বাবাকে বলতে পারিসনে?"

রঙ্কুর লোভ ছিল লজেন্সের ওপর। নিজের হাতখরচের পয়সা থেকে দিদি এক একদিন দু-এক আনার লজেন্স কি বিস্কুট তাদের জন্যে কিনে

নিয়ে আসে। কিন্তু আজ দিদির মেজাজ দেখে রঙ্কু আর তার দিকে ঘেঁষতে সাহস পেলনা।

একতলা পুরনো বাড়ি। গুনতিতে তিনখানা ঘর। কলেজে-পড়া বড় মেয়ে বলে রান্থর ভাগ্যে পুরোপুরি একখানা ঘরই জুটেছে। অন্যদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে নিজের ঘরে না গিয়ে রান্থ মা'র কাছে এসে বসে। তার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জোর করে ধমক দিয়ে ওষুধ পথ্য খাওয়ায়। কিন্তু আজ আর এসব করবার তার প্রবৃত্তি হলো না। কেন করবে। এ সংসারে রান্থকে তো এরা কেউ চায়নি। সে জোর করে এসেছে। সে অনাহূতা, অবাঞ্ছিতা।

অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা নিজের ঘরটিতে গিয়ে ঢুকল রান্থ। তক্তপোশের শিয়রে ছোট একখানি টেবিল। তার ওপর বইখাতাগুলিকে সশব্দে নামিয়ে রাখল। এক পাশে সস্তা দামের একটা র‍্যাক। কলেজের বই-খাতা সাজানো। স্থনীলের দেওয়া কয়েকখানি গল্প কবিতার বইও আছে।

অন্যদিন ঘরে এসে রান্থ টেবিল আর র‍্যাকটা একটু গুছিয়ে রাখে, রঙীন চাদরে ঢাকা বিছানাটা ঝাড়ে। কিন্তু আজ আর সে সব কিছুই করল না। ঘরে আলো জ্বালল না। অন্ধকার ঘরে আঝাড়া বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়ল। এ ঘরে সে নাও আসতে পারত, একান্ত নিজস্ব এই বিছানাটুকুতে শুয়ে সে নাও থাকতে পারত। সত্যি তার থাকাটাই আশ্চর্য, তার থাকবার কোন কথা ছিল না।

একটু বাদে বুলু এসে ঘরে ঢুকল। স্থইচ টিপে লাইট জেলে দিয়ে বলল, "দিদি, অমন ক'রে শুয়ে পড়লি যে, মা তোকে কতবার ডাকল।"

রান্থ বলল, "ডাকুক গিয়ে। বল গিয়ে আমার শরীর খারাপ করেছে।"

তাড়া খেয়ে বুলু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে এক হাতে চায়ের কাপ, আর এক হাতে মুড়ির বাটি হাতে নিয়ে বুলু ফের এসে দাঁড়াল রান্থর কাছে। বলল, "নে দিদি, খা।"

রান্থু বলল, "মুড়ি নিয়ে যা। মুড়ি আর খাব না। চায়ের কাপটা রাখ ওখানে।"

তারপর বোনের হাত থেকে কাপটা নিয়ে রান্থু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা বুলু, আমি যদি না হতাম তা হলে কি হতো রে?"

বুলু বলল, "কি বলছ দিদি, আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।"

সত্যি ও কি ক'রে বুঝবে। ওর তো কিছু বোঝবার কথা নয়।

রান্থু আর একটু পরিষ্কার করে বলল, "মানে আমি যদি এ পৃথিবীতে না আসতাম, না জন্মাতাম—"

বুলু বলল, "কি মাথা খারাপের মত যা তা বলছিস। আমি যাই এবার। অনেক কাজ আছে। রান্নাবান্না সারতে হবে। তুই খেয়ে নে।" মায়ের মত গিন্নীপনার ভঙ্গি করে বুলু বেরিয়ে গেল।

রান্থু মনে মনে ভাবল, সত্যি ওকে বোঝানো যাবে না। নিজের দুঃখ, শুধু ওকে কেন, কাউকেই বোঝাতে পারবে না রান্থু।

পাশের ঘরে বিছানায়, শুয়ে শুয়েই মা কয়েকবার ডাকলেন, "রান্থু এখানে আয়, আয় আমার কাছে।"

রান্থু প্রত্যেকবারই সে ডাক শুনল, কিন্তু একবারও সাড়া দিল না। কি করে যাবে? যেতে তার প্রবৃত্তি হচ্ছে না যে। কি করে তাকাবে মায়ের মুখের দিকে, চোখের দিকে? তাকালে নিজের মাকে কি আর সে দেখতে পাবে? পাবে না, কিছুতেই পাবে না। যে রান্থুকে চায়নি, হওয়ার আগেই সরিয়ে দিতে চেয়েছে, তাকে কি করে মা বলে ভাবতে পারবে রান্থু। পারবে না, কিছুতেই পারবে না।

খানিক বাদে রান্থুর বাবা হেমাঙ্গ অফিস থেকে বাসায় ফিরল। শুয়ে শুয়েই সব টের পেল রান্থু। শুয়ে শুয়েই শুনতে পেল বাবা তার কথা জিজ্ঞাসা করছে, "শরীর খারাপ হয়েছে? কেন কি হয়েছে রান্থুর?"

মা বলেছে, "কি আবার হবে? সব কথাই তোমার শোনা চাই, না?"

অন্যদিন পড়া রেখে রান্থু বাবার হাতমুখ ধোয়ার জন্যে জল গামছা, স্যাণ্ডাল এগিয়ে দেয়। চা করে। কিন্তু আজ আর উঠে সে বাবার সামনে গেল না। কেমন একটা যেন বীতস্পৃহা আর বিদ্বেষ বোধ

করছে রান্থ। কার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। কি ক'রে তাকাবে আজ সে বাবার মুখের দিকে? সে মুখে কি রান্থ আজ একজন খুনীর হিংস্র মুখই দেখতে পাবে না? নিজের স্বার্থের জন্যে, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সতের বছর আগে তাকে যে লোকটি একেবারে মুছে ফেলতে চেয়েছিল, যাতে সে না আসতে পারে তার জন্যে প্রাণপণে যে বাধা দিয়েছে, তার ওপর কোন মমতাই আজ আর বোধ করল না রান্থ। বরং তীব্র এক ধরনের দ্বেষ আর জিঘাংসায় তার মন ভরে উঠল।

কিছুক্ষণ বাদে চা-টা খেয়ে হেমাঙ্গ রান্থর ঘরে ঢুকল। আলোটা জ্বেলে দিয়ে মেয়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল হেমাঙ্গ। পাশ ফিরে শুয়ে আছে রান্থ। দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, "কি রে তোর নাকি শরীর খারাপ হয়েছে?"

রান্থ বাবার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, "হুঁ।"

হেমাঙ্গ বলল, "তাহলে আজ আর পড়াশুনো ক'রে কাজ নেই। রাত জাগিস নে। সকাল সকাল দুটি খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়। শরীর ঠিক হয়ে যাবে।"

একটু বাদে হেমাঙ্গ নিজের মনেই বলল, "যাই দেখি একটু হাতিবাগানের দিকে। হরেন দত্ত বলেছিল আজ গোটা দশেক টাকা দেবে। দেখি পাই নাকি। মাসের শেষ ক'টা দিন যেন আর কাটতে চায় না। অসুখ বিসুখে অস্থির হয়ে গেলাম। আর পারিনে বাপু। ডালভাত আর বড়া ভাজা হয়ে গেছে। গরম গরম খেয়ে নিগে যা রান্থ। খেলেই শরীর একটু ভালো লাগবে দেখিস।"

হেমাঙ্গের জুতোর শব্দ বাড়ির সদর পর্যন্ত গিয়ে মিলিয়ে গেল। ঠিক মা'র মতই বাবার গলা মাঝে মাঝে স্নেহকোমল হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ আর এই স্নেহে রান্থর মন ভিজল না। তার মনে হলো সব ভান, সব মিথ্যে। সে আকস্মিকভাবে বেঁচে গেছে ব'লেই তার ওপর বাবা মা'র এই স্নেহ, এই দয়া মায়া। কিন্তু সতের বছর আগে তো ওঁদের মনে একটুও দয়ামায়া ছিল না। ওঁরা তো চাননি রান্থ হয়,

রান্নু বেঁচে থাকে। ওঁরা তো তাকে সাধ ক'রে আদর ক'রে ডেকে আনেননি, বরং বারবার বাধা দিয়েছেন। এখনকার এই স্নেহমমতার কোন মানে হয় না। রান্নুদের বাসায় একটা নেড়ী কুকুর আছে। কে যেন জব্দ করবার জন্যে তাদের বাসায় বাচ্চাটাকে ফেলে গিয়েছিল। বাবা তাকে অনেকবার দূর দূর করেছেন, নিজে হাতে ক'রে বড় রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে এসেছেন, তবু বাচ্চাটা আবার ফিরে এসেছে। এখন বাবা নিজের হাতেই তাকে ভাত তরকারি আর মাছের কাঁটা দেন। এ বাড়িতে রান্নুর আদরও সেই অভ্যাসের আদর, সেই নেড়ী কুকুরের কেড়ে নেওয়া আদর। এ আদর সে চায় না, চায় না।

'আমি খাব না, কিছুতেই খাব না। রোজ রোজ ডাল দিয়ে খাব কেন? বাঃ রে!'

হঠাৎ চমক ভাঙল রান্নুর। রান্নাঘর থেকে রঙ্কুর নাকে কান্না শোনা গেল। সাত আট বছর বয়স হয়েছে। কিন্তু খাওয়া নিয়ে আজও কোঁদল গেল না। রান্নু মনে মনে ভাবল।

বুলু ভায়ের গলার অনুকরণ করে বলল, 'না খাবি তো উঠে, যা। রাজপুত্তুর এসেছেন। ডাল ভাত রোচেনা মুখ দিয়ে।'

রান্নুর মা পাশের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'কি হয়েছেরে বুলু? হয়েছে কি তোদের? ডাকাত পড়েছে নাকি? বাবারে বাবা, চেঁচিয়ে মেচিয়ে একেবারে অস্থির করে তুলেছে।'

বুলু বলল, 'আমাকে রাগ করছ কেন মা। বঙ্কু রঙ্কু কেউ শুধু ডাল দিয়ে খেতে চাইছে না।'

বঙ্কু প্রতিবাদ করে উঠল, 'এই ছোড়দি আমার নামে নালিশ করছিস যে। আমি কি করলাম।'

বুলু তাকেও রেহাই দিল না, বলল 'না উনি বিষ্টুদেবের গোড়া এসেছেন। নালিশ করবেনা। তুইও তো ভাত খাচ্ছিস নে। কেবল ঠেলে ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখছিস।'

রান্নুর মার আর সহ্য হলনা। আরো জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল,

'ঠাস ঠাস করে গোটা কয়েক চড় মারতো বুলু, চড় মার। তারপরে কান ধরে দু'টোকে ঘর থেকে বের ক'রে দে। দরকার নেই ওদের খাওয়ার। ডাল দিয়ে খেতে পারবিনে, তোদের জন্যে পোলাও মাংস কোত্থেকে আসবে শুনি? আর একজনকেও বলি। কি আক্কেল খানা তোমার। শিয়াল কুকুরের মত শুধু জন্ম দিয়েই খালাস। ওরা কি খাবে কি পরবে, তার একটুও যদি খোঁজ খবর নেয়। আমি শুয়ে শুয়ে আর ক'দিক সামলাব।'

রানু এবার তক্তপোশের ওপর ব'সে আঁচলটা ঠিক করে নিতে নিতে বলল 'মা আর চেঁচিও না। অত চেঁচালে তোমার অসুখ আরো বাড়বে।'

রানুর মা বলল, 'বাড়ে বাড়ুক। এখন মরলেই আমার হাড় জুড়োয়। যতদিন থাকব, সবগুলি আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। যন্ত্রণা আর সয় না। এর চেয়ে সাতজন্ম বাঁজা হয়ে থাকাও ভালো বাপু।'

রানু ডাকল, 'মা'।

'কিরে।'

'আচ্ছা তুমি যে ও কথাগুলি বললে তাকি সত্যি?'

'কোন কথাগুলি?'

'আমি যদি না হতুম, আমরা যদি না হতুম তাহলে তোমাদের কি সত্যিই ভালো লাগত?

'ও সে কথা বুঝি তোমার কানে গেছে। লাগতই তো, খুব ভালো লাগত।' বলে রানুর মা ফিক করে একটু হেসে ফেলল।

শীর্ণ মুখ, শুকনো ঠোঁট। তবু মা'র মুখের হাসিটুকু কি মিষ্টি। রানু অপলকে একটু বসে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। না এই সুখস্নিগ্ধ হাসির মধ্যে সতের বছর আগেকার কোন অপরাধের স্মৃতিচিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

রানু এবার উঠে দাঁড়াল।

মা বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস।'

রানু হেসে বলল, 'যাই দেখি রান্না ঘরে। শোননা এখনও কিরকম চাপা ঝগড়া চলছে তিনজনের মধ্যে।'

মা বলল, 'তা হলে যা। দেখ গিয়ে ভুলিয়ে টুলিয়ে খাওয়াতে পারিস নাকি। আর তুইও দুটো খেয়ে নিস রান্থ।

রান্থ মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণে সব তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কেন বাবা মা তখন তাকে চাননি, কেন তাঁরা এখনও রান্থদের সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারছেন না। আশ্চর্য, এই সোজা কথাটা বুঝতে তার এত সময় লাগল।

নিজের শোবার ঘর থেকে পাশের বড় ঘরখানায় চলে এল রান্থ। সারা মেঝেয় ঢালা বিছানা পাতা। মা অসুস্থ বলে তার বিছানা একটু আলাদা করে কোণের দিকে সরানো। আস্তে আস্তে রান্থ এবার সেই আধময়লা রোগ শয্যার পাশে এসে বসে পড়ল।

রান্থর মা বলল, 'ওকি তুই আবার এখানে এলি কেন? তোর না শরীর খারাপ হয়েছে।'

রান্থ বলল 'এখন আর তত খারাপ লাগছেনা মা।'

তারপর মায়ের আরো কাছে ঘেঁষে বসল রান্থ। রোগা হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে রান্থ বলল, 'বাবা আসুক মা, এলে একসঙ্গে খাব।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল রান্থ। কিন্তু মা আবার পিছু ডাকল, 'ওরে শোন। কথাটা তোকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। কি যে পোড়াছাই মন হয়েছে আমার। সুনীল এসেছিল। অনেকক্ষণ বসেছিল আমার কাছে। কত কথা আর কত গল্প। চমৎকার স্বভাব ছেলেটির।'

শুনবনা শুনবনা ক'রে রান্থ এবার বাইরে চলে এল। তাদের শোয়ার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানে ছোট্ট একটু উঠোন। সেই উঠোনের বরাবর মাথার ওপরে একফালি আকাশ। রান্থ তাকিয়ে দেখল সেই আকাশটুকু কখন যেন তারায় ভরতি হয়ে গেছে।

আশ্চর্য আকাশ, আর আরো সুন্দর এই পৃথিবী। রান্থ মনে মনে ভাবল। সে যদি না হ'ত তাহলে এই বিরাট আকাশ আর বিপুলা পৃথিবীর হয়ত কিছুই এসে যেতনা। কিন্তু কোন না কোন ভাবে রান্থ যখন একবার এসে পড়েছে তখন এর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই।

খাকি-পরা পিওন ঘরের সামনে এসে হাঁক দিল 'চিঠি আছে।'

ঘরে এক ছটাক চাল কি আটা নেই। মাস শেষ হওয়ার অনেক আগেই হাতের টাকা ফুরিয়ে গেছে। রেশন কি ক'রে আনবে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বাপ আর ছেলের মধ্যে। পিওনের ডাক তাদের কানে গেল না।

তারাপদ আর হরিপদ রেশনের কথাই বলাবলি করতে লাগল।

তারাপদ বলল, 'একটা টাকাও তোর কাছে নেই?'

হরিপদ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না বাবা। থাকলে কি আর—'

তারাপদ বলল, 'তাইতো, তোর কাছেই বা কোত্থেকে থাকবে।'

পিওন এবার বিরক্ত হয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'বলছি যে চিঠি আছে তা শুনতে পাচ্ছনা? নিজেরা কেবল গল্পই ক'রে যাচ্ছ।'

তারাপদ এবার ঘরের ভিতর থেকে মুখ বাড়াল। মাথার চুল বেশির ভাগই সাদা। ভ্রু'দুটিতেও পাক ধরেছে। সারা মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গালের আর কণ্ঠার সবগুলি হাড় বেরিয়ে এসেছে। সে মুখ এমনিতেই বিকৃত মনে হয়। তবু আরো বাঁকিয়ে আরো খিঁচিয়ে তারাপদ বলল, 'চিঠি এসেছে তো ফেলে দিয়ে যাও না। চেঁচাচ্ছ কেন।'

পিওন বলল, 'ভালো জ্বালা। চেঁচাচ্ছি কি সাধে! একি ফেলে দেওয়ার মত চিঠি! বিনা টিকিটে লেখা। বেয়ারিং হয়ে এসেছে। চার আনার পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে নাও।'

'বেয়ারিং। দেখি, কার চিঠি দেখি।' তারাপদ তার শীর্ণ হাতখানা পেতে দিল। চিঠিখানা নিয়ে লেখাটার উপরের ঠিকানাটিতে চোখ বুলাল। হ্যাঁ, তারই চিঠি। শ্রীযুক্ত তারাপদ দাস—শ্রীচরণ কমলেষু কাঁচা অসমান পরিচিত অক্ষরগুলি দেখে কার লেখা তা বুঝতে আর

বাকি রইল না। আর বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল তারাপদ, 'হরি ও হরি। এদিকে আয়, দেখ এসে মাগীর কাণ্ড। খাওয়া জোটে না আবার এনভেলপ ফুটিয়েছেন।'

হরিপদ এবার ভিতর থেকে বেরিয়ে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। বছর আঠের হবে বয়স। শ্যামবর্ণ, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ঠোঁটের নিচে কচি গোঁফ। প্রথম যৌবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য কি লাবণ্য কিছুই নেই। খোলা গায়ে হাড়গুলির আভাস দেখা যায়। যৌবনের সঙ্গে অর্ধাশন অনশনের এক চিরস্থায়ী সংগ্রাম তার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। তবু উঠতি বয়স সব বাধা ঠেলে ঝাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে।

বাপের দিকে তাকিয়ে হরিপদ বলল, 'ছিঃ বাবা ও সব কি বলছ।'
তারাপদ তেমনি চেঁচিয়ে উঠল, 'কি আবার বলব? চার আনা দণ্ড দিয়ে এ চিঠি কে রাখবে। তুমি এ চিঠি ফেরত নিয়ে যাও।'
পিওনের দিকে তাকিয়ে তারাপদ আবার বলল, 'যাও, ফেরত নিয়ে যাও চিঠি।'
পিওন বলল, 'বেশ দাও, সেখানে আবার আট আনা লাগবে।'
হরিপদ বলল, 'বাবা তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে।'

চিঠিটা অবশ্য নিজের হাতে রেখেই মুখে গালমন্দ চালাচ্ছিল তারাপদ। এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি করবি কর। আমার কাছে চার আনা তো ভালো, চারটি পয়সাও নেই।'

স্কুলের বেয়ারা দপ্তরীদের থাকবার জন্য ছোট্ট ঘর। খান দুই টুল জোড়া দিয়ে তারই মধ্যে একটু তক্তপোশের মত করা হয়েছে। তার ওপর পুরোন মাদুর, গোটা দুই বালিশ। আই এ ক্লাসের খান কয়েক বই খাতা গুছানো রয়েছে। শিয়রের দিকে একটা ছোট্ট তাক। তাতেও কিছু বই-পত্র, দেয়ালে সস্তা একটা আলনা। তাতে গোটা দুই ছেঁড়া আর ময়লা জামা ঝুলানো। জামা দু'টোর প্রত্যেকটা পকেট হাতড়ে দেখল হরিপদ, মিলল সাত পয়সা, মাদুরের তলা থেকে বেরোল একখানা দু'আনি। কুড়িয়ে নিয়ে তারাপদর

হাতে দিয়ে বলল, 'একটা পয়সা কম হচ্ছে বাবা, হবে না তোমার কাছে ?'

'জ্বালাতন, এই নাও, বিড়ি খাওয়ার জন্যে রেখেছিলাম' বলে তারাপদ ট্যাঁক থেকে একটা ডবল পয়সাই বের ক'রে দিল।

হেসে একটা পয়সা বাবাকে ফেরত দিল হরিপদ, তারপর পিওনকে চার আনা বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে চলে এল।

তারাপদ চিঠিখানা ছেলের হাতে দিয়ে বলল, 'নাও পড়। ক'দিন ধ'রে চোখে আবার কেমন ঝাপসা ঝাপসা দেখছি। হাসপাতালে গেলেই তো বলবে চশমা নাও, কিন্তু চশমার টাকা দেবে কে। নে পড় এবার চিঠিখানা।'

খামের মুখটা এবার ছিঁড়ে ফেলল হরিপদ, কাগজের ভাঁজ খুলল, তারপর পড়তে শুরু করল 'প্রিয়তম !'

সঙ্গে সঙ্গে একটু জিভ কেটে চিঠিটা উলটে রাখল হরিপদ। লজ্জায় মুখ নিচু ক'রে বলল, 'তুমি পড় বাবা।'

ভারি অপ্রস্তুত হলো হরি। আচ্ছা বোকা তো সে, ছি ছি। বাবার কাছে লেখা মা'র খামের চিঠি কেন খুলতে গেল, কেন পড়তে গেল ? এটুকু তার আক্কেল-বুদ্ধি হলো না। পোস্ট কার্ডের চিঠি পড়ে বলে স্বামীর কাছে লেখা স্ত্রীর খামের চিঠিও কি পড়া যায় ?

হরিপদ 'বলল, আমি বাইরে থেকে ঘুরে আসছি বাবা, তুমি ততক্ষণে চিঠিটা পড়ে নাও।'

হরিপদ উঠে বাইরে যেতে চাচ্ছিল, তারাপদ তাকে হাত ধ'রে থামাল। ছেলের এত লজ্জায় সেও প্রথমে একটু লজ্জিত হয়েছিল। বউটার কাণ্ড দেখ। এতদিন বাদে ফের আবার কি সব লিখতে শুরু করেছে। কিন্তু লজ্জা পেয়ে ছেলে একেবারে উঠে বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে তাকে হাত ধ'রে টেনে বসাল তারাপদ, 'বোস বোস। তোর আর যেতে হবে না। ওতে কি হয়েছে। ও তো শুধু একটা পাঠ। বাকি চিঠিখানা পড়ে ফেল এবার। ও রকম আর কিছু নেই।'

হরিপদ এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমিই তো পড়তে পার বাবা।'

তারাপদ হেসে বলল, 'আরে পারলে কি আর তোকে বলতাম। আমার চোখ দুটো কি আর আছে রে। এখন তোর চোখই আমার চোখ, পড় তুই।'

আর কোন তর্ক না ক'রে হরিপদ এবার সশব্দে পড়তে শুরু করল।

'পর পর তোমাকে আর হরিকে তিনখানা পোস্ট কার্ড দিয়াছি। টাকা পাঠাইবার কথা বলিয়াছি। কিন্তু টাকা পাঠান দূরে থাকুক, তোমরা কেউ একখানা চিঠির উত্তরও দিলে না। এক একখানা পোস্ট কার্ডের তিন পয়সা করিয়া দাম। এই তিনটি পয়সা কত কষ্টে আমাকে জোগাড় করিতে হয়, কত দরকারী জিনিস না কিনিয়া একখানা পোস্ট কার্ড কিনিতে হয়, তা কি তোমরা জান না? এই নয়টি পয়সা এক জায়গায় রাখিয়া দিলে তাহা দিয়া ছোট খুকির সাগু-বার্লি কিনিতে পারিতাম। কিন্তু চিঠি না দিয়াই বা পারি কি করিয়া। চিঠি দিলেই কেউ খোঁজ নাও না। আর না দিলে তো একেবারেই ভুলিয়া যাইবে। ভুলিতে পারিলেই তো বাঁচ। তিন-খানা পোস্ট কার্ডের কোন জবাব না পাইয়া আজ বেয়ারিং খামে চিঠি দিতেছি। রাগ করিয়া মজা দেখিবার জন্য না। আমার হাতে একটি পয়সাও নাই যে চিঠি দেই। ধার করিব, কার কাছে ধার করিব। চার দিকেই দেনা। যে দেখে সেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। কাহারও কাছে আমার হাত পাতিবার জো নাই।

তোমরা টাকা পয়সা পাঠান যদি এখন বন্ধ করিয়া দাও, পাঁচ পাঁচটি ছেলে-মেয়ে লইয়া আমি কি করিয়া থাকি। গাছ গাছালি যা ছিল বিক্রি করিয়া খাইয়াছি। আর কুটা গাছটিও নাই। এখন কোন্ পোড়া ছাই খাইব।

তোমার ক্ষমতার দৌড় তো দেখিলাম। হরিপদর পড়া ছাড়াইয়া তাহাকে কাজে ভেজাইয়া দাও। ভাল চাকরি-বাকরি না পায় কুলিগিরি মুটেগিরি করুক। দিন যদি কখনও ফেরে তখন পড়িবে। আর আমাকেও কলিকাতায় লইয়া যাও। দেখি পেটের ভাত জোগাড় করিতে পারি কি না। আর কিছু না পারি ঝি-গিরি তো করিতে পারিব। যাহার বাছারা দুইবেলা ক্ষিদায় কাঁদিয়া মরে

তাহার আর লজ্জা ভয় রাখিলে চলে না। ইতি, তোমার সরোজিনী।'

চিঠিখানায় অনেক বানান ভুল আছে। অক্ষরগুলিও কাঁচা কাঁচা। কিন্তু মুশাবিদা একেবারে পাকা উকিল মুহুরীর মত।

পড়া হয়ে গেলে ছেলের হাত থেকে চিটিটা নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল তারাপদ।

প্রথম যৌবনে বাপ-মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাত জেগে স্ত্রীকে নিজেই লেখাপড়া শিখিয়েছিল তারাপদ। সরোজিনীর তখন পড়ার দিকে মন ছিল না। কিন্তু তারাপদ নাছোড়বান্দা। একটু আধটু লিখতে পড়তে না জানলে তারাপদ যখন বিদেশে বিভূঁয়ে যাবে তখন তাকে চিঠিপত্র লিখবে কি করে সরোজিনী! কেমন করে জানাবে ভালবাসার কথা বিরহ-বেদনার দুঃখ! কিন্তু আজকালকার স্ত্রীর চিঠিপত্রের ধরন দেখে তারাপদর মনে হয় এর চেয়ে সরোজিনীকে নিরক্ষরা করে রাখাই ঢের ভালো ছিল। তাহলে অমন শ্রীছাঁদহীন কেঁচোর মত অক্ষরের মধ্যে অত তীব্র সাপের বিষ ভরে পাঠাতে পারত না।

মায়ের লেখা প্রিয়তম কথাটি দেখে প্রথমে হরিপদর যে পরিমাণ লজ্জা হয়েছিল পুরো চিঠিটা পড়বার পর রাগ তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি হলো। জ্বালা ধরে গেল মনে। দূর থেকে এমন চিঠিও কোন মেয়েমানুষ তার প্রিয়জনকে লিখতে পারে। সমস্ত চিঠিখানার মধ্যে প্রিয় কথা একটিও নেই। স্বামীর জন্য একটু সহানুভূতি, ছেলের জন্য একটু উদ্বেগ উৎকণ্ঠার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। কেবল টাকা আর টাকা, কেবল দাও আর দাও, ক্ষিধের আগুনে মায়ের মায়া মমতা সব যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রিয়তম পাঠটির কথাও মনে হলো হরিপদর। কথাটি নিশ্চয়ই বাবাকে পরিহাস করে ব্যঙ্গ করে লিখেছে মা। তাছাড়া এচিঠিতে ও পাঠের আর কোন অর্থ নেই। কিন্তু ব্যঙ্গ যে করে, মা কি নিজেই জানে না কি অবস্থায় এখানে তার স্বামী-পুত্রের দিন কাটে। ক্ষিধের ধাক্কা কি হরিপদ তারাপদর পেটেও নেই? কিন্তু উপায় কি? দিনের

বেলায় স্কুলের বেয়ারাগিরি করে তারাপদ মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা পায়। এখন এই হয়েছে সকলের সম্বল। বাকি টাকা ধার কর্জ ক'রে তোলে। একজনের কাছ থেকে টাকা এনে আর একজনকে শোধ দেয়। তা ছাড়া স্কুলের সেই পঁয়ত্রিশ টাকাই কি সব মাসে জোটে? আগাম নিয়ে নিয়ে বেশির ভাগ টাকাই তারাপদকে খরচ ক'রে ফেলতে হয়। নিজেদের খোরাকীটা পর্যন্ত হাতে থাকে না। মাসের মধ্যে কতদিন যে ছাতু খেয়ে মুড়ি খেয়ে দুই বাপ বেটাকে দিন কাটাতে হয় তার ঠিক নেই। দু'এক বেলা না খেয়েও কাটে।

বছরখানেক আগেও অবস্থা এত খারাপ ছিল না তারাপদর। এক দৈনিক কাগজের অফিসে রাত্রের চাকরি করত। তাতেও পেত টাকা চল্লিশেক। কিন্তু একটানা ক'বছর করবার পর শরীরে আর সইল না। অসুখে বিসুখে কেবলই কামাই হ'তে লাগল। অফিসে গিয়েও ভালো ক'রে কাজ করতে পারত না।

বাবুরা রিপোর্ট করলেন, 'এর দ্বারা চলবে না।'

হরিপদ বলল, 'আমার দ্বারা তো চলবে, আমি যাই বাবা।'

তারাপদ তাকে আঁকড়ে ধ'রে বলল, 'না তোকে কিছুতেই যেতে দেব না। তুই পড়। বেয়ারাগিরি তোর জন্য নয়। ভালো ক'রে পরীক্ষা দিলে তুই বিত্তি পাবি।'

ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট বয় ছিল হরিপদ। কিন্তু পরীক্ষার ফল যা আশা করেছিল তা হয়নি, বৃত্তি পায়নি। শুধু প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। তারাপদ বলেছে 'এ পরীক্ষায় না পেলি, পরের পরীক্ষায় পাবি। তুই পড়।'

বাপের অনুরোধ এড়াতে পারেনি হরিপদ। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে ফ্রীশিপ জোগাড় করেছে। মোটামুটি ভালো কলেজ দেখে ভর্তি হয়েছে আই এস সি'তে। স্কলারশিপ এবার তার পাওয়াই চাই।

কিন্তু মায়ের চিঠি পড়ে হরিপদর আজ বার বার মনে হ'তে লাগল কলেজে তার আর ভর্তি না হওয়াই উচিত ছিল। সংসারে যার এই অবস্থা পড়াশুনো তার পক্ষে বিলাসিতা, মা ঠিকই লিখেছে। কি হবে হরিপদর কেমিস্ট্রি ফিজিকসের তত্ত্বে। সে কুলী মজুরিই করবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর তারাপদ বলল 'শুনলি তো হারামজাদীর চিঠির বয়ান। এখন কি করবি কর।'

হরিপদ রূঢ়ভাবে বলল, 'আমি কি করব। আমি তো তখনই বলেছিলাম আমার আর পড়ে কাজ নেই বাবা। তা তুমি কিছুতেই ছাড়লে না। যদি বল পুরোন ছেঁড়া বই-কখানা কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে বিক্রি ক'রে আসি। আর আমার কি করবার আছে।'

তারাপদর দুই চোখ ছল ছল করে উঠল, 'হরি তুই এই কথা বলতে পারলি। বই বিক্রির কথা তুই উচ্চারণ করতে পারলি মুখ দিয়ে।'

হরিপদ লজ্জিত হয়ে চুপ ক'রে রইল। এসব কথা তার বাবা কোন দিন সহ্য করতে পারে না। সে ছাড়া তারাপদর আর কোন গর্বের সামগ্রীই নেই। সে বিদ্বান হবে, বড় হয়ে অগাধ যশ আর অর্থের অধিকারী হবে, এ-ছাড়া তারাপদর আর কোন স্বপ্ন নেই, সাধ নেই মনে। তারাপদ জানে নিজের যা হবার হয়ে গেছে। এখন সমস্ত সম্ভাবনা শুধু হরিপদর মধ্যে। ছেলের মধ্যেই এখন সমস্ত কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত ক'রে রেখেছে তারাপদ। সে কথা হরিপদ জানে। স্কুলে যখন সে পড়ত তারাপদ তার প্রোগ্রেস রিপোর্ট আর প্রাইজের বইগুলি নিয়ে অফিসের বাবুদের দেখিয়ে বেড়াত। তাঁদের কাছ থেকে টাকা চাইত, বই চাইত। হরিপদ বলত, ছিঃ বাবা, আমার নাম ক'রে অমন ভিক্ষে করে বেড়াও আমার ভারি লজ্জা করে।

তারাপদ বলত, 'লজ্জা কিসের রে? বড় হয়ে তুই আবার কতজনকে ভিক্ষা দিবি।'

হরিপদর সংকোচ দেখে, আত্মাভিমান দেখে তারাপদ তাকে বাইরে কারো কাছে হাত পাততে পাঠায় না। ধার কর্জ নিজেই ক'রে আনে। সময়মত শোধ দিতে না পেরে পাওনাদারদের গালমন্দ সহ্য করে। তবু ছেলেকে পারতপক্ষে অভাবের আগুনের মুখে এগিয়ে দেয় না।

কিন্তু আজ সেই তারাপদই বলল, 'আমি চেষ্টায় বেরোই। তুইও একটু ঘুরে দেখ গোটাকয়েক টাকা জোগাড় করতে পারিস কিনা।'

হরিপদ একটু যেন বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি বেরোব ?'
তারপর নিজের প্রশ্নের ধরনে নিজেই লজ্জিত হলো।
তারাপদ বলল, 'বেরোবিনা কি করবি বল। চিঠিখানা তো নিজেই পড়লি।'
চিঠির কথা মনে পড়ায় হরিপদর বুকের মধ্যে আবার জ্বালা করে উঠল। মা তাকে পড়া ছেড়ে কুলীগিরি ধরতে বলেছে।
হরিপদ বলল, 'হ্যাঁ পড়েছি। কিন্তু কি করব বল।'
তারাপদ লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'কলেজে তোর বন্ধুবান্ধব প্রফেসাররা তো আছে, তাদের কাছে—'
হরিপদ রুক্ষস্বরে বলল, 'তাদের কাছে আমি হাত পাততে পারব না বাবা। আর হাত পাতলেই বা আমাকে দেবে কে।'
তারাপদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আচ্ছা তাহলে আমিই বেরোই। উল্টাডিঙ্গির আড়তের শ্রীবিলাস্ কুণ্ডু নাকি আজই দেশে যাবে। তার কাছে গোটাকয়েক টাকা গছিয়ে দিতে পারলে কাজ হতো। দু'দিনের মধ্যে টাকাটা তারা পেয়ে যেত। হাতে টাকা আসলেই তো আর মনি-অর্ডার করবার জো নেই। ভেবেছিলাম শ্রীবিলাসের সঙ্গে পাঠাব। কিন্তু টাকার জোগাড়ই হলো না। সে নাকি আজই ঢাকা মেলে যাবে।
হরিপদ বলল, 'যায় যাক। গেলে আর কি করব।'
টাকা হাতে এলেও হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের গোলমালে তা পাঠাবার জো নেই। দুই দেশের মধ্যে মনি-অর্ডারের ব্যবস্থা বন্ধ! ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার সেই সোনাপুর গ্রামে কি তার কাছাকাছি কে কখন যাবে অপেক্ষায় থাকতে হয়। সোনাপুরের পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরের কুণ্ডুরা উল্টাডিঙ্গিতে তেল আর আলকাতরার ব্যবসা করে। সেই আড়তে মাঝে মাঝে টাকা জমা দেয় তারাপদ। সেখান থেকে লোক মারফৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করে। হরিপদ সবই জানে। তবু জেনে শুনেও চুপ ক'রে ব'সে রইল।
খানিকটা কি ভেবে তারাপদ উঠে দাঁড়াল। চৌদ্দ পয়সা দিয়ে ছেলের কেনা সেই সস্তা আলনাটায় গোটা দুই ছেঁড়া জামা ঝুলানো আছে।

তার একটা তুলে নিল। আজকাল আর বাছাবাছির দরকার হয় না। ছেলে বড় হওয়ার পর সুবিধা হয়ে গেছে। তার জামা গায়ে দিয়ে বেরোলেই চলে।
হরিপদ বলল,—'ওকি ওই ছিটের শার্টটা নিলে কেন। ওটা তো কাঁধের কাছে একেবারেই ছিঁড়ে গেছে। ওই সাদাটা নাও, ওটা অত ছেঁড়েনি। আমার তো আজ আর কলেজ নেই। ভালোটাই নিয়ে যাও তুমি।'
ইচ্ছা ক'রে বেশি ছেঁড়া জামাটা গায়ে দিয়ে কেন বাবা বেরোয় তা হরিপদ জানে। তাদের দুরবস্থাটা লোকের যাতে আরো বেশি করে চোখে পড়ে, যাতে লোকের মনে আরো বেশি রকম অনুকম্পা জাগে সেই চেষ্টা। ছেঁড়া স্যাণ্ডাল জোড়া থাকতে, তা তালিটালি দিয়ে ঠিক ক'রে আনলেও তা ফেলে রেখে ধার-কর্জের সময় খালি পায়েই বেরিয়ে পড়ে তারাপদ। অর্ধাশনে গলা অমনিতেই চিঁ চিঁ করে তবু পাছে কেউ মনে করে ওদের খাওয়া দাওয়া বেশ চলছে তাই আরো নীচু গলায় আরো অস্পষ্ট অস্ফুট স্বরে তারাপদ কথা বলে। বাবার এই কাণ্ড দেখে মাঝে মাঝে হরিপদর লজ্জা হয়। তারা কি যথেষ্ট দরিদ্র নয় যে ভিক্ষার জন্য আরো ভোল চাই।
তারাপদ এগিয়ে এসে বলল, 'চিঠিখানা দে তো।' হরিপদ বলল, 'চিঠি, চিঠি দিয়ে তুমি কি করবে।' তারাপদ ছেলের কথার জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করল, আস্তে আস্তে বলল, 'এই নিতাম একটু।'
বাপকে ধমকে উঠল হরিপদ 'নিতাম একটু।' তুমি ভেবেছ ওই চিঠি লোককে দেখিয়ে ধার করবে, ভিক্ষে করবে। তা আমি তোমাকে করতে দেব না বাবা। ও চিঠি আমি কাউকে দেখাতে দেব না।'
ছেলের এই দীপ্ত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে তারাপদ যেন একটু খুশী হোলো। এ যেন নিজেরই বিবেকের ধমক, নিজেরই যৌবনের জেদ। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কাউকে দেখাতাম না। আচ্ছা, ও চিঠি তোর কাছেই রাখ তুই।'
সামনে স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। রক্তরঙের ফুল আর ফুল। গাছের পাতা দেখা যায় না। কিন্তু দুই ডালের

ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নীলচে রঙের একটি দোতলা বাড়ি। দেখা যায় তার ছাদে নানা রঙের শাড়ি উড়ছে পতাকার মত।
ঘরের বাইরে এসে তারাপদ আর হরিপদ দু'জনেই সেই বাড়িটির দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারাপদ বলল,'হরি, যাব নাকি একবার উকিলবাবুর কাছে? তিনি তো এখন কোর্টে গেছেন, গিন্নীর কাছে আর একবার গোটাকতক টাকা চেয়ে দেখব নাকি?'
হরিপদ চেঁচিয়ে উঠল, 'ফের আবার ওখানে যেতে চাইছ? তোমার লজ্জা করল না বাবা? কি করে কথাটা তুমি বললে।'
শেষের দিকে শুধু ধমক নয়, খানিকটা আক্ষেপ আর অনুযোগের স্বরও ফুটে উঠল হরিপদর গলায়। বই বিক্রির কথায় তারাপদর যেমন উঠেছিল।
তারাপদ ছেলের দিকে একটুকাল চেয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা তবে থাক।'
তারাপদ ফুলে ঢাকা কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশ দিয়ে স্কুলের বড় গেটটার দিকে এগিয়ে গেল। ডাল থেকে একটা ফুল ঝরে পড়ল তার সেই ছেঁড়া জামার ওপর। অন্যমনস্কের মতই তারাপদ বাঁ হাত দিয়ে সেই ফুলটা ঝেড়ে ফেলে দিল।
হরিপদ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তার বাবা সেই নীলচে রঙের বাড়ির পাশ দিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।
আকাশ রঙের ওই বাড়িটির কাছে থেকে হরিপদরা এক সময় খুব সমাদর পেয়েছিল। আজ সেই সমাদর ঔদাসীন্যে এমন কি অপমানে এসে ঠেকেছে।
তারাপদ যেমন আরো পাঁচজনকে বলে, ওই বাড়ির কর্তা উকিল জগন্ময় সেনকেও তেমনি হরিপদর কৃতিত্বের গল্প শুনিয়েছিল। ক্লাসে হরিপদ ফার্স্ট হয়, সব বিষয়ে বেশি বেশি নম্বর রাখে, অঙ্কে একটি নম্বরও কেউ তার কাটতে পারে না; তারাপদর মুখে এসব গল্প শুনে জগন্ময় বলেছিলেন, 'আচ্ছা নিয়ে এসো একদিন তোমার ছেলেকে, আলাপ করে দেখব।'
তারপর বাপের সঙ্গে একদিন গিয়ে হাজির হয়েছিল জগন্ময়ের ড্রয়িং-

রুমে। একতলায় সোফা কোচে সাজানো গুছানো ঘর। বড় একখানা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে জগন্ময় আইনের বইতে চোখ বুলাচ্ছিলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না।
তারাপদ বলল, 'ছেলেকে নিয়ে এসেছি বাবু।'
'নিয়ে এসেছ? বেশ বেশ, বোসো ওখানে।'
বলে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিলেন জগন্ময়। আর সঙ্গে সঙ্গে হরিপদ তাতে বসে পড়ল। জগন্ময় একটু হেসে তারাপদর দিকে তাকালেন, 'তুমিও বোসো না ওখানে।'
তারাপদ জিভ কেটে বলল, 'আজ্ঞে না বাবু, ও বসেছে তাতেই আমার হয়েছে। আমি একটু ঘুরে কাজ সেরে আসি। আপনি ওকে যা জিজ্ঞাসবাদ করবার করুন।'
জগন্ময়বাবু হেসে বললেন, 'জিজ্ঞাসাবাদ আবার কি করব। ও কি আসামী।'
তারাপদ চলে গেলে অত বড় একজন গম্ভীর স্বভাবের মানুষের সামনে বসে থাকতে থাকতে হরিপদ কেমন যেন অসহায় বোধ করল।
বই-এর মধ্যে ফের খানিকক্ষণ ডুবে রইলেন জগন্ময়বাবু। তারপর কি খেয়াল হওয়ায় আবার মুখ তুললেন, 'বেশ বেশ। মনোযোগ দিয়ে পড়। ভালো রেজাল্ট কর। দুঃখকষ্টের মধ্যেই মানুষ বড় হয়।'
পাশের ঘর থেকে একটি মিষ্টি গুনগুনানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জগন্ময় সেদিকে তাকিয়ে একটু হেসে ডাকলেন, 'মিলি, এদিকে এসো।'
'কি বাবা।'
আঠার উনিশ বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে ঘরে ঢুকল। জগন্ময়বাবু হরিপদকে দেখিয়ে বললেন, 'একে চেন?'
মিলি হেসে বলল, 'চিনব না কেন। সামনের স্কুল-বাড়িটায় থাকে।'
জগন্ময়বাবু বললেন, 'সেকথা বলছি না। ছেলেটি খুব ভালো তা জানো? ওই স্কুলের ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। ফার্স্ট হয়। অঙ্কে ফুল মার্কস পায়। তোমাদের মত নয়, অঙ্কের নাম শুনলেই তো তোমাদের মাথা ঘোরে।'

মিলি হেসে বলল, 'বাবা, অঙ্কের এলাকা কবে পার হয়ে এলাম, তবু তোমার সে আফসোস গেল না?'

জগন্ময়বাবু এবার পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার ছোট মেয়ে। স্কটিশে পড়ছে। থার্ড ইয়ার। ইংরাজীতে অনার্স নিয়েছে। আমি ম্যাথেমেটিকসটাই ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা কেউ ওদিকে যায়নি। মিলি, ছেলেটিকে একটু মিষ্টি-টিষ্টি এনে দাও। বলে দাও না রাণীকে।'

হরিপদ অস্ফুট স্বরে বলল, 'না না।' মিলি বলল, 'এদিকে এসো।'

অভিভূতের মত হরিপদ তার পিছনে পিছনে গেল।

ভিতর দিকের একটা বারান্দায় নিয়ে গিয়ে মিলি ডেকে বলল, 'রাণী ওকে একটু জলখাবার আনিয়ে দাও তো। আচ্ছা, আমি এবার যাই। একটু তাড়া আছে। আর একদিন আলাপ হবে।'

জলখাবারে তেমন যেন আর রুচি রইল না হরিপদর। একটু বাদে প্লেটে করে দু'টি রসগোল্লা আর দু'টি সন্দেশ এনে সামনে রাখল আর একটি মেয়ে। বছর ষোল সতের বয়স। কালো হ্যাংলা চেহারা। হরিপদ ওকে চেনে! এ বাড়ির ঝিয়ের কাজ করে মেয়েটি। কখনো কখনো রাঁধেও। জগন্ময়বাবু তাঁদের গ্রাম থেকে ওকে নিয়ে এসেছেন।

আসন পেতে খাবার দিয়ে মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

হরিপদ বলল, 'তুমি হাসছ যে।'

রাণী বলল, 'হাসছি তোমার রকম সকম দেখে। জানলা দিয়ে সব আমি দেখছিলাম। কি স্পর্ধা বাপরে বাপ। বাবু বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাঁর ওই সামনের সোফায় বসে পড়লে? একটু লজ্জা হলো না, ভয় হলো না? কই তোমার বাবা তো সাহস পেল না বসতে। তোমার এত সাহস এলো কোত্থেকে।'

এই মুখরা মেয়েটির সামনে লজ্জায় অপমানে হরিপদ মাথা নীচু করে রইল। মিষ্টিগুলি গলা দিয়ে যেন নামতে চাইল না।

'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে রাণী।'

মোটা সোটা একটি মহিলা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

রাণী বলল, 'এই হরিপদর সঙ্গে মা। না হয় পড়েই ফার্স্ট ক্লাসে। তবু এত সাহস, বাবুর সামনে সোফায় গিয়ে বসল। কিন্তু বসে থাকতে পারবে কেন, অভ্যেস তো নেই। উসখুস, উসখুস। যেন ছারপোকায় কামড়াচ্ছে।'

মহিলাটি হেসে তাকে তাড়া দিয়ে বললেন, 'তুই যা তো এখান থেকে। আর জ্বালাসনে। ছেলেটাকে তুই কি খেতে দিবিনে?'

মহিলাটি জগন্ময়বাবুর স্ত্রী—মিলিদির মা, হরিপদ তা দেখেই বুঝেছিল।

তিনি সস্নেহে বললেন, 'তুমি খেয়ে নাও বাপু। ওর কথায় কিছু মনে করো না।'

সেই থেকেই পরিবারটির সঙ্গে হরিপদর আলাপ। তারপর যাতায়াতের পথে মিলি তাকে দেখতে পেলেই হেসে কথা বলেছে। পড়াশুনোর খবর জিজ্ঞাসা করেছে। মাঝে মাঝে যেতেও বলেছে তাদের বাড়িতে।

কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর হরিপদর সঙ্কোচও অনেকখানি কেটে গেছে। মিলি কি মিলির মা তাকে মাঝে মাঝে এটা ওটা দোকান থেকে কিনে আনতে বললে ভারি কৃতার্থ বোধ করেছে হরিপদ। এঁরা যে এত আদর-যত্ন করেন, তার বিনিময়ে কিছু না দিলে যেন স্বস্তি পায় না হরিপদ। কিন্তু মিলিদিকে কি দেওয়ারই বা তার সাধ্য আছে, তার ফুট-ফরমাশ খাটা ছাড়া।

অবশ্য খাটাবার সময়ও খুব ভদ্রতা করে কথা বলে মিলি। মিষ্টি হেসে বলে, 'যাও তো ভাই, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে কিছু ফুল নিয়ে এসো।'

কিংবা 'বিডন স্ট্রীটে আমার একজন বন্ধু থাকেন। ঊর্মিলা সান্যাল। তার কাছ থেকে আমার হিস্ট্রির নোটটা এনে দিতে পারবে? ট্রাম ফেয়ারটা নিয়ে যাও।'

হরিপদ বলে, 'না না, ট্রাম ভাড়া আমার কাছে আছে।'

মিলিদির কাছ থেকে পয়সা না নিয়ে সে হেঁটেই চলে যায় বিডন

স্ট্রীট। বাড়িতে এত লোকজন, এত চাকর-বাকর, মিলির পরে ছোট দুই ভাই। তবু এসব শৌখীন কাজে হরিপদকেই তার পছন্দ।

এই পছন্দের সুযোগ নিয়ে তারাপদ ওদের কাছ থেকে টাকা ধার করে। কোন মাসে কর্তার কাছে চায়, কোন মাসে গৃহিণীর কাছে, কোন মাসে বা মিলির কাছে হাত পাতে।

হরিপদর এটা পছন্দ নয়। একদিন সে বললে, 'বাবা, আর যাই করো, ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ো না।'

তারাপদ বলল, 'কেন রে।'

হরিপদ বলল, 'আমার ভালো লাগে না।'

তারাপদ ছেলের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি তো একেবারে নিই না; ধার নিই, আবার দু'চার টাকা করে শোধও দিয়ে দিই।'

হরিপদ মিলিদের বাড়িতে আসে যায়। রাণীর দিকে তাকায় না, তার সঙ্গে পারতপক্ষে কথাও বলে না। লেখা পড়া শিখে সে যেন মিলিদি আর তার ভাই অমল বিমলদের একজন হয়ে গেছে।

বছর খানেক মেলামেশা ঘনিষ্ঠতার পর হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। মিলির দেওয়া শরৎচন্দ্রের একখণ্ড বাঁধানো গ্রন্থাবলী হাতে সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, পাশের রান্নাঘর থেকে রাণী বেরিয়ে এসে তার পথ আটকে, দাঁড়াল, 'এই শোন, এই হরিপদ শোন।'

হরিপদ থমকে দাঁড়াল, 'কি বলছ।'

রাণী বলল, 'আমাকে ওই মোড়ের দোকানটা থেকে চার আনার হলুদ এনে দাও তো।' হলুদ আনার কথায় হরিপদ ভারি অপমান বোধ করল। মনের রাগ চেপে বলল, 'আমার হলুদ আনার সময় নেই। আর কাউকে বলো।'

রাণী বলল, 'আর আবার কাকে বলব। গণেশ, গোবিন্দ কাউকেই তো দেখছিনে, তুমিই এনে দাও।'

গণেশ গোবিন্দ এ বাড়ির চাকর। তাদের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার রাগে

সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল হরিপদর। চড়া গলায় বলল, 'আমি পারব না। আমি কি তোমার চাকর?'
রাণী হেসে বলল, 'আমার চাকর হবে কেন, তুমি কার চাকর তা সবাই জানে।'
হরিপদ যেন গর্জে উঠল, 'কি, কি বললে।'
রাণী বলল, 'মিথ্যে কিছু বলি নি। বেয়ারার বেটাকে চাকর বলেছি।'
কথাটা শেষ হতে পারল না রাণীর। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিল হরিপদ।
রাণী চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা গো মেরে ফেললো।'
চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে হরিপদকে ধরে ফেলল। দোতলা থেকে মিলি নেমে এল, এলেন মিলির মা। গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন, 'ছোটলোকটাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দাও। এতবড় স্পর্ধা, আমার বাড়ির ঝি-এর গায়ে হাত তোলে। আমি গোড়াতেই বলেছি মিলি, ওর চালচলন আদবকায়দা ভাল না। ওকে অত আস্কারা দিসনে। বলে কি না লেখাপড়ায় ভালো। আরে লেখাপড়া শিখলেই কি ছোটলোক ভদ্রলোক হয়ে যায়?'
মিলি ফোঁস করে উঠল, 'আমাকে আবার এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন মা আমি কি আস্কারা দিলুম।'
মিলির মা বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক বাপু থাক।'
ঘাড় ধরে কেউ অবশ্য বের করে দিল না। হরিপদ নিজেই মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল। ক্লাসে ঢি ঢি পড়ে গেল। হরিপদ ভালো ছেলে হলে কি হবে—অভদ্র, মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলে। স্কুলের হেডমাস্টার পর্যন্ত ডেকে নিয়ে তাকে শাসন করে দিলেন, 'এমন করলে তোমাকে আমি আর স্কুলে রাখতে পারব না হরিপদ।'
হরিপদ নালিশের ভঙ্গিতে বলল, 'ও আমাকে বাপ তুলে গাল দিয়েছে।'
হেডমাস্টার মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'ভারি অন্যায় করেছে। বেয়ারাকে বেয়ারা বলেছে। তাই বলে ওই সোমত্ত মেয়ের গায়ে হাত দিবি?'
জগন্ময়বাবু স্কুল কমিটির বিশিষ্ট সদস্য।

তারাপদ নিজেও ছেলেকে খুব গালমন্দ করল। বলল, 'ওকে তুই মারতে গেলি কেন?'

ছেলের অনুরোধে মাস তিনেকের মধ্যে তারাপদ জগন্ময়বাবুদের সব টাকা শোধ করে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হরিপদর আর সে বাড়িতে ডাক পড়ল না। ভেবেছিল মিলিদি অন্তত একবার ডাকবেন, সব কথা শুনতে চাইবেন। কিন্তু তার কাছ থেকেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কিছুদিন বাদে লক্ষ্য করল মিলিদির কলেজের প্রফেসর হিরন্ময়বাবু ও বাড়িতে খুব যাতায়াত করছেন, প্রফেসর হলে হবে কি, মিলিদির সঙ্গে তার আলাপ ব্যবহার বন্ধুর মত। গান শোনেন, তাস খেলেন, সিনেমা দেখেন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোন। আরো মাসচারেক পরে শোনা গেল মিলিদির পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে দুজনের বিয়ে হবে।

বেলা আড়াইটা তিনটায় তারাপদ ফিরে এল ঘরে। বৈশাখের কড়া রোদ গেছে মাথার ওপর দিয়ে। চেহারাখানা পুড়ে অঙ্গার। ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করছে হরিপদ। একবার ঘরে ঢুকছে আর একবার বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছে।

বাপকে দেখে এগিয়ে গেল কাছে। বলল, 'পেলে কিছু?'

তারাপদ সংক্ষেপে বলল, 'না।'

তারপর বসল গিয়ে ঘরের কোণে—দেয়ালে ঠেস দিয়ে। সেই শ্যামবাজার থেকে হেঁটে এসেছে এই বৌবাজার পর্যন্ত। এখন আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। শক্তি থাকত যদি টাকা আসত হাতে।

তারাপদ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'খেয়েছিলি কিছু?'

হরিপদ খেঁকিয়ে উঠল, 'কি আবার খাব? ঘরে কি কিছু আছে?'

তারাপদ বলল, চার আনার পয়সা খরচ করে চিঠিটা না রাখলেই পারতি, কাল-পরশু নিতাম। না হয় ফেরতই যেত।'

হরিপদ চুপ করে রইল—এখন তারও সেই কথা মনে হচ্ছে। চিঠিটা না রাখলেই হতো। চার আনা থাকলে দু'জনে চিড়েমুড়ি খেয়ে এবেলা কাটাতে পারত।

হঠাৎ তারাপদ বলল, 'সেখানেও সব শুকিয়ে মরছে। আজই শ্রীবিলাস

চলে যাবে। কিছুই করে উঠতে পারলুমনা। যার কাছে চাই, সেই বলে মাসের শেষ, পাঁচ সাতদিন পরে এসো দেখবো চেষ্টা করে!'
হরিপদ রেগে উঠে বলল, 'চেষ্টা না ঘোড়ার ডিম করবে।'
তারপর জামাটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল হরিপদ। চিঠিটা পড়েছিল তক্তপোশের ওপর। বুকপকেটে পুরল।
তারাপদ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় চললি।'
হরিপদ কোন জবাব দিল না।
হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদহের মোড়ে এসে দাঁড়াল। চারদিক থেকে লোকজন আসছে যাচ্ছে। ট্রাম-বাস-ট্যাকসীর শব্দ। এখানে এমন কিছু ঘটে না যে, হরিপদকে কেউ ডেকে নিয়ে চাকরিতে বসিয়ে দেয়। স্টেশনের ভেতর থেকে একজন লোক দু'হাতে দুই স্যুটকেস ঝুলিয়ে বেরোল। হরিপদ তাঁর দিকে দু'পা এগিয়ে গেল। একবার ভাবল, ভদ্রলোকের হাত থেকে স্যুটকেসটা চেয়ে নেয়, বলে 'বাবু, আমাকে দিন। চার আনার পয়সা দেবেন, যতদূর বলেন, ততদূর বয়ে নিয়ে যাব।'
কিন্তু মনে যা আসে, মুখে কি সব সময় তা বলা যায়—হরিপদ চেষ্টা করেও একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না। ভদ্রলোক তার দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন। হয়ত ভাবলেন, গুণ্ডা কি পকেটমার।

হরিপদ বুঝতে পারল এই মুহূর্তেই কুলীগিরি মজুরিগিরি করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। বাপের মত তাকেও ধারের চেষ্টায় বেরোতে হবে। কিন্তু যায় কার কাছে। টাকা চাওয়ার মত ঘনিষ্ঠ আলাপ কারো সঙ্গেই হয়নি হরিপদর। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল সুবিনয় চাটুয্যের কথা। ওর বাবার রেডিও আর ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির দোকান আছে চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর মোড়ে। কলেজে প্রায়ই হরিপদর পাশাপাশি বসে। ভালো ছেলে বলে হরিপদকে খাতিরও করে। দু'দিন বাড়িতে ডেকে এনে চা খাইয়েছে। খানিকটা এগিয়ে বৈঠকখানা রোডের মোড়ে তেতলা বাড়িটার

সামনে এসে হরিপদ কড়া নাড়ল। প্রথমে বেরিয়ে এল চাকর, বলল, 'খোকাবাবু তো ঘুমুচ্ছেন।'
হরিপদ বলল, 'ডেকে দাও, বল জরুরী দরকার আছে।'
লোকটি হরিপদর চেহারার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'এখন ঘুম ভাঙালে খুব চেঁচামেচি করবেন। দরকার থাকে বৈঠকখানা ঘরে বসুন। চারটেয় ঘুম ভাঙবে।'
হরিপদর ভাগ্য ভালো। আধ ঘণ্টা খানিক আগেই ঘুম ভাঙল সুবিনয়ের। ড্রয়িং-রুমে ঢুকে বলল, 'কি আশ্চর্য, ফ্যানটাও খুলে দাও নি, এই গরমে মানুষ থাকতে পারে। আমি তো ফ্যানের নিচেও হাঁফিয়ে উঠেছি। কলকাতা থেকে এখন পালাতে পারলে বাঁচি। এই গরমে মানুষ থাকে এখানে?'
হরিপদ একটু হাসতে চেষ্টা করল, 'তা ঠিক। তোমাদের বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। যাও নি যে।'

সুবিনয় বলল, 'যেতে আর পারলাম কই, কলেজ ছুটি হয়ে গেছে কবে। তবু এখানেই পচে মরছি। বাবার হুকুম বাড়ি আগলাতে হবে। চাকর-বাকরের ওপর বিশ্বাস নেই। একদল গেছেন কালিম্পং-এ। তাঁরা ফিরে এলে আমি ছুটি পাব। তারপর তোমার কি খবর। তুমি যে এই অসময়ে। ভালো ছেলেরা কি বেড়ায় নাকি? কখনো বই ছেড়ে ওঠে? অবাক কাণ্ড।'
হরিপদ চোখমুখ বুজে বলে ফেলল, 'বড় বিপদে পড়ে এসেছি ভাই, আমাকে গোটা পঁচিশেক টাকা ধার দিতে হবে।'
সুবিনয় কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বলল, 'টাকা! ধার! তুমি কি বলছ হরিপদ।'
কিন্তু হরিপদ মরীয়া হয়ে উঠেছে। বলল, 'আমাকে না দিলেই চলবে না সুবিনয়।'
সুবিনয় বলল, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু অত টাকা আমি পাব কোথায়।' এই দিন-কয়েক আগেও একশ টাকা পিকনিকে খরচ করে এসেছে কলেজের বন্ধুদের কাছে সেদিন সুবিনয় গল্প করছিল।

ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে সে খবরও হরিপদ জানে। এ সব কথা মনে উঠলেও হরিপদ চুপ করে রইল।
সুবিনয় বলল, 'কিছু মনে কোরো না। অত টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি কোনদিন বলনি। এই প্রথম মুখ ফুটে চাইলে। আমি যা পারি দিচ্ছি।'
ভিতর থেকে একখানা দশ টাকার নোট নিয়ে এল সুবিনয়, বলল, 'আমি এ সব ধার দেওয়া টেওয়া পছন্দ করিনে হরিপদ। বন্ধুদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। বাবাও তাই বলেন। এমনি করে তিনি অনেক বন্ধু হারিয়েছেন। আজ-কাল আর দেন না। বলেন, না দিয়ে কষ্ট একবার আর দিয়ে কষ্ট একশবার।'
হরিপদ ভাবল নোটটা সুবিনয়কে ফেরত দেয়। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল, দিতে পারল না। কিছু বলতে পারল না। শুধু মনের ভিতরটা জ্বলে যেতে লাগল।
সুবিনয় একটু বাদে হেসে বলল, 'কিছু মনে কোরো না ভাই, আমি শুধু আমার প্রিন্সিপলের কথা বললেম। ও টাকা তোমাকে ফেরত দিতে হবে না।'
হরিপদ বলল, 'নিশ্চয়ই দিতে হবে। আমিও আমার প্রিন্সিপলের কথা বলছি।'
অন্য দিন বাড়িতে এলে চা খাওয়ায় সুবিনয়। কিন্তু আজ আর বোধ হয় ওর সে উৎসাহ নেই। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামল হরিপদ। পেটের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি জ্বলছে মন। মা'র জন্যই এই অপমান সে সইল। না হলে নিজের জন্য কারো কাছে সে হাত পাতত না। সুবিনয়ের দশ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসত। বুক-পকেটে চিঠিটা এখনো আছে। ওর ভিতরের অক্ষরগুলি তো অক্ষর নয়, জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরো।
হরিপদ আর দেরি করল না। কোথাও কোন দোকানের সামনে দাঁড়াল না। টাকাটা নিয়ে আপার সার্কুলার রোড ধরে সোজা হেঁটে চলে গেল উল্টোডিঙ্গির সেই কুণ্ডুদের আড়তে। শ্রীবিলাস কুণ্ডু বাঁধা-ছাঁদা শুরু করেছেন। তার হাতে দশ টাকার নোটটা গছিয়ে

দিয়ে বলল, 'এই নিন। পাকিস্থানী হিসাবে যা পাওনা হয়, মাকে দেবেন।'

শ্রীবিলাস বলল, 'দেব। চিঠিপত্র কিছু দেবে নাকি আমার কাছে!'

হরিপদ বলল, 'না। বলবেন আমরা ভালো আছি। চিঠিতে কিছু লেখার নেই বলেই চিঠি দিলাম না। আর বলবেন যেন কক্ষনো অমন বেয়ারিং চিঠি না দেয়।'

শ্রীবিলাস মৃদু হেসে বলল, 'বলব।'

হরিপদ আড়ত থেকে ঝড়ের মত বেরিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে বাসায় গিয়ে যখন পৌছল, সন্ধ্যা উতরে গেছে। তারাপদ তখনও দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে আছে। চোখ দুটো বোজা। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। হরিপদর সাড়া পেয়ে উঠে বসল, বলল, 'হরি এলি।'

'হুঁ।'

'খেয়েছিলি কোথাও কিছু?'

'কোথায় আবার খাব।'

'না বলছিলাম কোন বন্ধু টন্ধুর বাড়িতে যদি—'

'কত বন্ধু আমার জন্যে রাজভোগ সাজিয়ে বসে আছে। দশ টাকা শ্রীবিলাসের হাতে দিয়ে এলাম। মাকে দেওয়ার জন্যে।'

তারাপদ খুশী হয়ে বলল, 'দিতে পেরেছিস তাহলে কিছু? ওর থেকে ভেঙে আট আনা এক টাকার খেলেই পারতিস।'

হরিপদ রুক্ষ স্বরে বলল, 'ওর থেকে আবার কি খাব। যার পেটে সর্বগ্রাসী ক্ষিদে সেই সব খাক। আমাদের কিছু খেয়ে কাজ নেই।'

কুঁজো থেকে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বাপের দিকে পিছন ফিরে তক্তপোশের ওপর শুয়ে পড়ল হরিপদ। তারাপদ সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটুকাল কি দেখল। তারপর উঠে বাইরে চলে গেল।

খানিক বাদে ফিরে এসে ছেলের পিঠে হাত রেখে বলল, 'হরি, শোন।'

হরিপদ এদিকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'কি বলছ।'

তারাপদ বলল, 'এবেলা তোর খাওয়ার ব্যবস্থা করে এলাম।'
হরিপদ এবার সাগ্রহে মুখ ফেরাল, 'কোথায় ?'
তারাপদ বললে, 'ওই উকিলবাবুর বাড়িতে। গিন্নীমাকে বলে এলাম, এবেলা যেন তোর জন্যে—'
হরিপদ আর্তনাদ করে উঠল, 'বাবা ফের তুমি ওই বাড়িতে ঢুকেছ ? তোমার কি মান সম্মান বলতে কিছু নেই ?'
অন্ধকারে তারাপদ আর একবার ছেলের পিঠে হাত রাখল, মাথার চুলে হাত বুলাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না হরি, আর কিছু নেই। বেচবার মত আর কিছু নেই আমার, ঘরে নেই, দেহে নেই। মনের ওই একফোঁটা মান সম্মান, ওই এক ছিটে ধর্ম। তোর প্রাণের চেয়ে কি তার দাম বেশি হরি। না বেশি না। প্রাণটুকু রাখ। তারপর যদি দিন আসে আবার সব ফিরে পাবি।'
হরিপদ আস্তে আস্তে বলল, 'বাবা।
তারাপদ বলতে লাগল, 'আমার কাছে আর কিছুর দাম নেই। জানিস আজ শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতবার কত গয়নার দোকানের সামনে থেমে দাঁড়িয়েছি। ইচ্ছে হয়েছে চুরি করি, ডাকাতি করি।'
হরিপদর এবার হাসি পেল, 'বাবা, চুরি করবার কি কোন কায়দা-কানুন তুমি জানো যে চুরি করবে। গায়ে কি একফোঁটা বল আছে যে, ডাকাতি করবে তুমি।'
তারাপদ বলল, 'তা নেই। কিন্তু চেষ্টা করলে জেলে যেতে তো পারি। সেখানকার চোর ডাকাতের দলে ভিড়ে গেলে ক'দিন আর লাগবে আমার খাঁটি চোর, খাঁটি ডাকাত হতে। আমি সব পারি হরি, কেবল তোর মুখের দিকে চেয়েই কিছু করতে পারিনে।'
হরিপদ বলল, 'ও সবে তোমার কাজ নেই বাবা, ওসব তোমার ভেবে কাজ নেই।'
তারাপদ একটু যেন লজ্জিত হলো। খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে বলল, 'কথাটা তোর কাছেই বললাম, আর কারো কাছে বলিনি। কেবল দোকানের সামনেই দাঁড়াইনি। আজ সারাদিনভর চেনা

শোনা অফিস আদালতগুলিতেও কি কম ঘোরাঘুরি করেছি। কতজনকে বলেছি, বাবু আমি ভিক্ষে চাইনে, ধার চাইনে কাজ করতে চাই, একমাস আমি না খেয়েও খাটতে পারব। একমাস পরে আমাকে পয়সা দেবেন।'

একটু যেন কৌতূহল বোধ হল হরিপদর, জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলল তারা।'

'কি আবার বলবে। রোজ যা বলে তাই বলল, কাজ নেই, কাজ কোথায়, আর এক বাবু তো হেসেই অস্থির। তিনি বললেন বুড়ো তোমার আর কাজের বয়স নেই, তোমার এখন কথার বয়স। ওই কাঠামোয় আর হবে না। এ জন্মে নয়, আর এক জন্মে এসো।'

হঠাৎ ছেলেকে তারাপদ শক্ত ক'রে ধরল 'আর এক জন্ম আমার তুই হরি। তোকে আমি কিছুতেই শুকিয়ে মরতে দেব না। মান সম্মান যাক আমি আর কিছু চাইনে, তোর প্রাণটুকু বাঁচুক।'

হরিপদ চুপ করে রইল।

তারাপদ বলল 'আমি সব বলে এসেছি। তোর মুখ ফুটে কিছুই বলতে হবে না। তুই গিয়ে দাঁড়ালেই সবাই বুঝতে পারবে। ঘাড় গুঁজে মুখ বুজে খেয়ে আসবি। আজকের রাতটা কাটুক, কালকের ভাবনা কাল।'

তারাপদ জামাটা ফের গায়ে দিতে লাগল।

হরিপদ বলল, 'আবার কোথায় চললে বাবা।'

তারাপদ বলল, 'যাব একটু পার্কসার্কাসে। স্থরেনবাবুর বাসায়। তিনি দেখা করতে বলেছিলেন! দেখি যদি কোন স্থবিধে টুবিধে হয়।'

স্থরেন রায় কলেজের প্রফেসর। সকালে বিকালে রাত্রে সব সময়ই আজকাল কলেজ চলে। সেই কলেজে রাত্রে একটি বেয়ারার কাজের জন্য অনেকদিন থেকেই যে চেষ্টা করছে তারাপদ, হরিপদ তা জানে। আশা প্রায় নেই বললেই চলে। তবু তারাপদ যাতায়াত ছাড়ছে না।

হরিপদ বলল, 'কিন্তু আজই কেন যাবে?'

তারাপদ বলল, 'যাই গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে। সেখানে গেলে তারা খালি চা-ই দেয় না মুড়ি হোক, রুটি হোক, কিছু না কিছু দেয়।'

লজ্জিত-ভঙ্গিতে তারাপদ একটু হাসল।

হরিপদ বলল, 'তবে যাও'।

তারাপদ বেরোবার আগে আর একবার বলে গেল 'তুই কিন্তু যাস। আমি যা বললাম করিস, আমার কথা শুনিস হরি।'

হরিপদ বলল, 'আচ্ছা।'

তারাপদ চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ সে বিছানায় শুয়ে রইল। বাবা তাহলে সব ব্যবস্থা করে এসেছে, গিয়ে বললেই হয়। কিন্তু কি ক'রে যাবে। যে বাড়ির লোক তাকে ঘাড় ধ'রে অমন করে বার ক'রে দিয়েছে সে বাড়িতে অনাহূতভাবে ফের গিয়ে কোন মুখে পাত-পাতবে হরিপদ। তাছাড়া ওদের হেঁসেলের ভার তো সেই রাণীর ওপর। তার কথা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ফের জ্বালা করে উঠল হরিপদর। সেই ঘটনার পর আসতে যেতে তাকে অনেকবার দেখেছে হরিপদ। কিন্তু প্রত্যেকবারই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পাছে চোখ পড়ে, পাছে বড়লোকের বাড়ির ওই সোহাগী ঝি মেয়েটার চোখে ব্যঙ্গের হাসি, মজা দেখার হাসি দেখতে হয়। না কিছুতেই আর ও বাড়িতে যাওয়া চলে না, কিছুতেই যাবে না হরিপদ।

কিন্তু রাত যত বাড়তে লাগলো মনের জ্বালা মনের জ্বালাকে ছাড়িয়ে চলল পেটের জ্বালা। হরিপদ ছটফট করতে লাগল, ঘর-বার করতে লাগল।

উঠানে সেই রাঙা কৃষ্ণ-চূড়ার গাছটা ফুলের রাশ মাথায় ক'রে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে ফুলের রঙ কালো রাত্রের অন্ধকারে সব ঢেকে গেছে। গা ঢাকা দিয়ে হরিপদও চলে যাবে নাকি আস্তে আস্তে—কে দেখবে। নিজেকেই নিজে দেখা যায় না। আর কোন দিকে তাকাবে না হরিপদ। শুধু ভাতের দিকে ছাড়া।

কিন্তু গলির ওপারে ও-বাড়িতে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় সব দেখা যাবে যে। সেই আলোয় আর একজন সব দেখবে। না কিছুতেই যেতে পারে না হরিপদ, কিছুতেই না।

সদরের ফটকের কাছে অনেক বার গেল হরিপদ আবার ফিরে এল। দেউড়িটুকু আর পার হ'তে পারে না। দিনভর কলকাতায় কত

জায়গাতেই তো ঘুরে এল কিন্তু গলির এই পথটুকু পার হ'তে হরিপদর পা অবশ হয়ে আসছে।

ক্রমে ও-বাড়ির আলোও নিবে এল। খেয়েদেয়ে সবাই ওপরে চলে গেল। সব অন্ধকার। হরিপদর চোখের সামনে অন্ধকার জগৎটা ঘুরপাক খাচ্ছে। ফের ঘরে এসে ঢুকল হরিপদ। কুজোটা ধরল মুখের সামনে উপুড় ক'রে। শূন্য, জল ধরার কথা কারোরই মনে নেই।

'ভূতের মত অন্ধকার ঘরে কি করছ?'

'কে?' ঘুরে দাঁড়াল হরিপদ, 'কে তুমি।'

ফিক ক'রে একটু হাসির শব্দ শোনা গেল।

'পেত্নী।'

হরিপদ অস্ফুট-স্বরে বলল, 'রাণী?'

'হ্যাগো হ্যা, শুধু রাণী নয়, রাজ-রাণী, মহারাণী, আলো জ্বালো এবার। হাত ভেঙে গেল। ভাতের থালাটা কোথায় রাখি, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। স্যুইচটা কোথায়।'

হরিপদ বলল, 'স্যুইচটা নষ্ট হয়ে গেছে। মিস্ত্রী ডেকে সারিয়ে নিতে হবে।'

রাণী বলল, 'তবেই হয়েছে। ততক্ষণ বুঝি এই অন্ধকার ঘরে থাকব তোমার সঙ্গে? লোকে কি বলবে শুনি।'

হরিপদ বলল, 'শোনাশুনির দরকার কি, ভাতের থালা তুমি নিয়ে যাও। ও-বাড়ির ভাত আমি খাব না।'

'ও-বাড়ির ভাত নয়, আমার ভাগের ভাত। মানী-পুরুষকে কি আমি যার তার ভাত খাওয়াতে পারি?'

রাণী ফিক ক'রে ফের একটু হাসল।

খুঁজে খুঁজে চারপয়সা দামের একটা আধপোড়া মোমবাতি হরিপদর বিছানার তলা থেকে পাওয়া গেল। ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে। দেশলাইও মেলল একটা। একটি কি দু'টি কাঠি এখনো আছে। আলো জ্বেলে রাণী বসল পাতের কাছে। থালাভরা ভাত আর মাছ তরকারি। ভাত মেখে মুখে দেওয়ার আগে হরিপদ রাণীর চোখের দিকে তাকাল।

রাণী বলল, 'কি হলো, এমন মানী পুরুষ এমন তেজী পুরুষের চোখে জল। ছি ছি ছি।'

হরিপদ বলল, 'তা নয়, আমার মা'র কথা মনে পড়েছে।'

এঁটো বাসন কুড়িয়ে নিয়ে রাণী চলে গেল। আর তার খানিক পরেই ফিরে এল তারাপদ। এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, 'গিয়েছিলি? খেয়েছিলি?'

হরিপদ মুখ নিচু করে বলল, 'যেতে হয়নি বাবা সে নিজেই এসেছিল।'

তারাপদ বলল, 'কে?'

হরিপদ আরও মুখ নামাল, অস্ফুট লজ্জিতস্বরে বলল, 'রাণী।'

তারাপদ কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সেই হাড় বের করা ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখ প্রসন্ন হাসিতে কোমল হয়ে উঠেছে।

একটু বাদে তারাপদ বলল, 'চিঠিখানা কি করেছিলিরে হরি।'

হরিপদ বলল, 'আমার কাছে আছে বাবা, দেব?'

তারাপদ একটু যেন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'দে তো দেখি—চারগণ্ডা পয়সা দিয়ে রাখলাম, ভালো ক'রে শোনাই হোল না।' হরিপদ উঠে গিয়ে বুক পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে আনল। মোমের যে টুকরোটা পড়ে ছিল সেটা জ্বেলে দিল। তারপর বাপের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলল, 'নাও বাবা পড়।'

তারাপদ একটু হেসে বলল 'কেনরে সকালের মত তুই-ই পড়না।'

হরিপদ বলল, 'না বাবা, তুমিই পড়, মনে মনে পড়।'

তারাপদ বলল, 'আচ্ছা দে।'

হরিপদ ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছিল তারাপদ তার হাত ধরে থামাল, সস্নেহে একটু ধমকের সুরে বলল,—

'বোস এখানে। ভারি তো ইয়ে হয়েছে।'

হরিপদ আর কোন কথা না বলে বাপের পাশে বসে পড়ল। ছেলের এক হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আর এক হাতে স্ত্রীর চিঠি খুলে ধরল তারাপদ। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, মোমের বাতি নিবু নিবু। যে চিঠির অর্থ দিনের সেই প্রখর আলোয় ভালো করে ধরা পড়েনি এখন এই আধো অন্ধকারে যদি তার রহস্য কিছু বোঝা যায়।

ই সংক্ষিপ্ত জীবন চরিতটি আমার বন্ধু নীলাম্বরের মা সৌদামিনী সেনের। গত ১০ই ভাদ্র একাত্তর বছর বয়সে কলকাতার তালতলা লেনের বাসায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি শোক-সন্তপ্ত বৃদ্ধ স্বামী, দশটি ছেলে-মেয়ে, গুটি তিরিশেক নাতি নাতনী রেখে গেছেন। আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে আরও দশজন গৃহস্থ বধূর যেভাবে দিন কাটে এই মহিলাটির দীর্ঘ জীবনও সুখে দুঃখে সেই ভাবেই কেটেছে। শেষ পর্যন্ত তার এই মৃত্যুকেও সুখের মরণই বলা যায়। পাকা চুলে সিঁদুর পরে স্বামী, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রদের সামনে তিনি যে চোখ বুজতে পেরেছেন বধূজীবনে এর চেয়ে বড়োভাগ্যের আর কি আছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শী সবাই এই এক কথাই বলছেন।

ঘটনার দু'দিন পরে শোকার্ত নীলুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমিও তাকে ওই গতানুগতিক ভাষাতেই সান্ত্বনা দিলাম—'তোমাদের সবায়ের সামনে তিনি যে যেতে পেরেছেন'—ইত্যাদি।

নীলাম্বরের গায়ে সাদা চাদর, চুল উস্কোখুস্কো, হাতে একখানি আসন। বাইরের ঘরের তক্তপোশের ওপর সেটুকু পেতে মুখোমুখি বসে নীলাম্বর আমার কথা সমর্থন ক'রে বললো, 'হ্যাঁ তিনিই ভালোই গেছেন।' নীলাম্বরের বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়েছে। সে তার মায়ের তৃতীয় সন্তান, তার বড় আরো দুই দিদি আছেন, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে নীলাম্বর স্বল্পভাষী স্বভাব-গম্ভীর মানুষ। সুখে দুঃখে ওকে কোনোদিন বিচলিত দেখিনি। আজও দেখলাম না।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, 'মাসীমা কি যাওয়ার সময় কিছু ব'লে যেতে পেরেছেন? কোনো শেষ ইচ্ছে-টিচ্ছে। নীলাম্বর মাথা নেড়ে বললো, 'না, সে সব কিছু নয়। তবে একটা ঝাঁপি তিনি রেখে গেছেন কল্যাণ! দেখবে!' বললাম, 'আনাওনা'।

নীলাম্বর তার আটবছরের মেয়েকে ডেকে বলল, 'মায়া, তোর মাকে বল, মা'র সেই ঝাঁপিটা এখানে নিয়ে আস্থক। কল্যাণকে দেখাই।'
একটু বাদে সেকেলে বড়ো পুরোনো একটা সস্তার ঝাঁপি হাতে নীলাম্বরের স্ত্রী স্থরমা এসে ঘরে ঢুকলো। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে নীলাম্বর স্থন্দরীভার্যা। গুটি চারেক ছেলেমেয়ের মা হওয়ার পরেও স্থরমার লাবণ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে। স্বামীর গুরু দশার অংশ নিয়েছে স্থরমা। লাল পেড়ে কোরা মিলের সাড়িতেও তাকে বেশ স্থন্দর দেখাচ্ছে। আজ যেন একটা স্তব্ধ গম্ভীর বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে তার রূপে। হঠাৎ আমার মনে হ'লো মধ্যযৌবনে নীলাম্বরের মাও কি এইরকমই ছিলেন।
একটা টুল টেনে আমাদের সামনে বসলো স্থরমা। তারপর ঝাঁপিটা তক্তপোশের ওপর রেখে ছোটো একটা চাবি স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'খোলো।'
নীলাম্বর বললো 'তুমিই খুলে দেখাও।'
স্থরমা তালা খুলে ঝাঁপির ডালা উঁচু ক'রে তার ভিতর থেকে শাশুড়ীর সম্পত্তি একে একে বার ক'রে দেখাতে লাগলো!

প্রথমেই বেরোলো চটি একখানি ছাপা কবিতার বই, নাম—'স্থরের ছোঁয়া! তারপর মোটা একখানি খাতা। বিবর্ণ পাতাগুলি ভ'রে কাটাকুটি ভরা অনেকগুলি কবিতা। তারপর বাকি পাতাগুলি একেবারে সাদা। অতি যত্নে নীল রঙের একখণ্ড কাপড়ে জড়িয়ে রাখা রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সের ছোটো একখানি ফটো। একটি নেকড়ায় বাঁধা অনেকগুলি তামার পয়সা, ভিতরের কালি শুকিয়ে যাওয়া একটি দোয়াত, একটি সাধারণ সরু কাঠের হাণ্ডেলের কলম, সাদা খামের মধ্যে একখানি চিঠি।
চিঠিখানির কথা পরে বলবো। আগে শ্রীমতী সৌদামিনী সেন প্রণীত সেই চটি কবিতার বইখানির কথা ব'লে নিই।
ফুল পাখী নদী পর্বত নিয়ে কিছু নিসর্গ কবিতা, দাম্পত্য স্থখ-দুঃখ মান-অভিমানের কথা, পয়ার ছন্দে প্রথম সন্তান লাভের আনন্দ

বর্ণনার প্রয়াস, শেষের দিকে রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহমূলক কিছু গান—এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে সবই স্থান পেয়েছে। সাধারণ অনাড়ম্বর ভাষা। মাঝে মাঝে ছন্দের ভুল আছে। ছাপার ভুলও যথেষ্ট, ভাবে ভঙ্গিতে মৌলিকতা বিশেষ কিছু নাই। পঞ্চাশবছর আগের কয়েকজন জনপ্রিয় কবির প্রভাব কবিতার বইখানিতে সুস্পষ্ট।

নেড়েচেড়ে বইটি রেখে দিয়ে নীলাম্বরের দিকে চেয়ে বললাম, 'তোমার মা লেখিকা ছিলেন, একথা অনেকদিন আগে তুমি একবার আমাকে বলেছিলে আমার মনে পড়ছে।'

নীলাম্বর একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বললো, 'ঠিক পুরোপুরি লেখিকা বললে হয়তো ঠাট্টা করা হবে। লিখতে আর পারলেন কই। তবে শিল্প সাহিত্যকে মা শেষদিন অবধি ভালোবাসতেন কল্যাণ, আমরা যেটুকু যা পেয়েছি, যা হয়েছি তা আমাদের মা'র জন্যেই।'

নীলাম্বরদের মতো এমন একটি শিল্পী পরিবার সত্যিই খুব কম দেখা যায়। নীলাম্বর নিজে নামকরা প্রাবন্ধিক, ওর মেজো ভাই সরোজ সেতারে সুদক্ষ, সেজো ভাই গায়ক, তার পরের এক ভাই চিত্রশিল্পী। বোনদের মধ্যেও দুজন গায়িকা আছেন। অবশ্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবাই যে সমান কৃতী তা নয়। কয়েক ভাই এই শিল্পের ধারা থেকে রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য কি চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রেও ছিটকে পড়েছে, কিন্তু শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতে প্রত্যেকেরই সহজাত রুচি আর আগ্রহ উৎসাহ রয়ে গেছে।

পরিবারটির এই বিশিষ্টতা আজ যেন আমার নতুন ক'রে চোখে পড়লো। এতো শিল্পানুরাগ তা হ'লে ওরা মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে। একি শুধু বংশানুক্রমিক ফল, না ওদের মা হাতে ধরে ওদের শিখিয়েছেন, এক একটি ছেলে-মেয়েকে শিল্পের বিভিন্নরূপে প্রবৃত্তি দিয়েছেন, জানবার ভারি কৌতূহল হ'লো আমার। খুব যে সদুত্তর পেলাম তা নয়। এই শিল্পপ্রীতি আর অনুশীলনের প্রবৃত্তি ওদের মধ্যে নানা কারণে এসে থাকবে। নীলাম্বরদের বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের প্রারম্ভ কুমিল্লা শহরে কাটে, শহরটি

তখনকার দিনে শিল্প সাহিত্য চর্চার একটি কেন্দ্রস্থল ছিলো। বিশেষ ক'রে সঙ্গীত চর্চার তো বটেই। নীলাম্বরের স্কুল কলেজের মাস্টার মশাইদের, কি ওর সহপাঠী সমবয়সীদের মধ্যেও সাহিত্য, সঙ্গীতের অনুশীলন তখন প্রচুরভাবে চলতো। সেই পরিবেশ থেকেও ওরা প্রেরণা পেয়ে থাকবে। শুধু মা নয়, মাতৃভূমিও ওদের মনে শিল্পরস জুগিয়েছে, সৃষ্টি প্রবৃত্তির সহায়তা ক'রেছে। সৌদামিনী সাধারণ লেখাপড়া জানা মেয়ে, গুনগুন ক'রে এক আধটু গান গাইতেও জানতেন। ছেলে-মেয়েদের হাতে ধ'রে শেখাবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর ছিলো না। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ দিতেন প্রচুর একথা ঠিক। অর্থ, বিষয়-আশয় এমনকি স্কুল-কলেজের সার্থক ছাত্রজীবনের চেয়েও ছেলেদের এই শিল্পবোধ আর শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে তিনি বেশী মূল্য দিতেন।

এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তাঁর নিত্য বিরোধ লেগে থাকতো।

হরিমোহন রাগ ক'রে বলতেন, 'তুমিই ছেলেগুলির মাথা খেলে। তোমার কি ইচ্ছে ওরা যাত্রার দলের, কবির দলের দোহার আর বেহালা বাজিয়ে হোক ?'

সৌদামিনী জবাব দিতেন 'আমাকে মিথ্যে দোষারোপ করছো। ওরা ওদের ইচ্ছানুযায়ী চলে, যাতে আনন্দ পায় তাই করে। ওরা যদি হ'তে না চায় তুমি শত চেষ্টা করলেও কি ওদের জজ ম্যাজিস্ট্রেট বানাতে পারবে ?'

হরিমোহন বলতেন, 'জজ ম্যাজিস্ট্রেট না হোক লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি-বাকরি ক'রে খাক। দশজন ভদ্রলোকের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে বসতে শিখুক। কিন্তু তুমি যা ওদের ক'রে তুলছো তাতে সব বাবরি রেখে লুঙ্গি পরে বিড়ি টানবে আর পাড়াময় শিস দিতে দিতে তেরছা চোখে তাকাবে পরের ঘরের মেয়ে-ছেলেদের দিকে। এ জীবনে রসের সাধক কম দেখলাম না। পরিণাম তো ওই। বৈদ্যের ঘরের ছেলে। ছি ছি ছি—আমার বংশ থেকে একটা ডাক্তার বেরোলোনা, উকিল বেরোলোনা। এর জন্যে তুমিই দায়ী বড় বউ।'

সৌদামিনী প্রতিবাদ করতেন 'আমিই দায়ী! আমার বুঝি ইচ্ছে করেনা ওরা ভালো হোক, বড়ো হোক? ওরা কি আমার পেটের ছেলে না আমার সতীনের পেটের?' তারপর খোঁটা দিয়ে বলতেন, 'ডাক্তারী ওকালতী পড়াতে পয়সা লাগে।'

নীলাম্বরের বাবা ছিলেন জজ কোর্টের পেশকার। প্রথম জীবনে পয়সা নেহাৎ কম রোজগার করেননি। শেষের দিকে সন্তান বাহুল্যে বেশি বিব্রত হয়ে পড়লেও দু'একজনকে ডাক্তার মোক্তার করবার সামর্থ্য তাঁর ছিল। কিন্তু কোনো ছেলেরই সেদিকে ঝোঁক গেলোনা। এই নিয়ে আফসোসের তাঁর অন্ত ছিলোনা। শেষ বয়স অবধি স্ত্রীর সঙ্গে এ জন্যে তিনি ঝগড়া করেছেন। সে ঝগড়া নীলাম্বররা তো বটেই তার ছোট ভাই বোনরা পর্যন্ত বড়ো হয়ে শুনেছে। কতোদিন যে হরিমোহন রাগ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন, আর সৌদামিনী উপোস ক'রে রয়েছেন তার ঠিক নেই?

নীলাম্বর তার বাল্য কৈশোরের স্মৃতিভাণ্ডার থেকে মায়ের কথা তুলে আনতে লাগলো। স্বল্পভাষী নীলু আজ বড়ো মুখর হ'য়ে উঠেছে। সুরমাও এ বাড়ীতে বউ হ'য়ে এসে অবধি শাশুড়ীর জীবনের যেটুকু দেখেছে শুনেছে তার থেকে কিছু কিছু তথ্য জোগালো।

আমি এক সময় জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, ওঁর লেখার ঝোঁকটা কি ক'রে এসেছিলো আর তা উনি ছাড়লেনই বা কেন।'

লেখার ঝোঁক কি ক'রে যে আসে তা বলা বড়ো সহজ নয়। নিজের কথাই বলা যায় না আর তো অন্যের। মায়ের লেখার প্রবৃত্তি কি ক'রে এলো তা নীলাম্বর ভালো ক'রে জানে না। নীলাম্বরের দূর সম্পর্কের এক মামার লেখার অভ্যাস ছিলো। নিজের লেখা বই ছাড়াও তিনি তখনকার দিনের বিখ্যাত লেখকদের কাব্য উপন্যাস সৌদামিনীকে উপহার দিতেন। সৌদামিনী তাঁর সামান্য বিদ্যা বুদ্ধি নিয়ে অবসর সময়ে সেগুলি পড়তেন। সেগুলি ফুরিয়ে গেলে পাড়া-পড়শীদের কাছে নতুন বইয়ের খোঁজ করতেন। যখন পেতেন না, পুরোনো বইগুলিই ফের নতুন ক'রে পড়া সুরু করতেন। এমনিভাবেই বোধ হয় তাঁর একদিন লেখার শখ হ'লো। পড়ার

সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখতেও আরম্ভ করলেন। কখনো বা লক্ষ্মীর আমলের পিতলের দীপের কাছে বসে, কখনো বা স্বামী যখন পাড়ায় কবিরাজ বাড়িতে দাবা খেলায় মত্ত সেই ফাঁকে হ্যারিকেন জেলে ছন্দ মেলাতে বসতেন সৌদামিনী। যে মিল সংসারে স্বামীর মনের সঙ্গে হ'লোনা সেই মিল যদি ছন্দে গেঁথে তোলা যায়। কোনোদিন ঢেঁকিশালায়, কোনোদিন রান্নাঘরে, উনুনের কাছে সৌদামিনীর কাব্যসাধনা চলতো।

একদিন খেতে বসে হরিমোহন হেসে বললেন, 'বড় বউ, আজ ডালে ঝোলে কোনোটাতেই নুন লঙ্কা দাওনি, তোমার লেখা পদ্যের গুঁড়ো ছিঁটিয়ে দিয়েছো। কিন্তু তাতে তো আর ঝোলের স্বাদ মেলে না। গুণ হ'য়ে দোষ হ'লো বিদ্যার বিদ্যায়। এই বিদ্যাবতী স্ত্রীকে আমি যে কোথায় রাখি কাঁধে না পিঠে, তা আর ভেবে পাইনে।'

ভারি লজ্জা পেলেন সৌদামিনী। অনুতাপের স্বরে বললেন, 'আর কোনোদিন এমন হবে না, আমাকে মাপ করো।'

কিছুদিনের জন্য কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা রইলো।

সেবার পূজোর ছুটির আগে একজন শাঁসালো মক্কেলের কাছ থেকে হরিমোহনের কিছু উপরি টাকা হাতে এলো। খুশী হ'য়ে স্ত্রীকে বললেন, 'বড় বউ এসো তোমাকে এক ছড়া হার গড়িয়ে দিই, কি রকম হার তোমার পছন্দ বলো। নাজিরের বউয়ের মতো বিছে 'হার নেবে ?'

আঁচলটা মাথার ওপর একটু তুলে দিয়ে স্বামীর দিকে হেসে তাকালেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'আমার একটা কথা রাখবে ?'

'বলো।'

সৌদামিনী লজ্জায় কুণ্ঠায় আবার একটু হাসলেন, তারপর বলেই ফেললেন কথাটি, 'আমি হার চাইনে।'

'তবে কি চাও ?'

'আমার কবিতার বইখানা তোমাদের ওই শ্রীনাথ প্রেস থেকে ছেপে দাও।'

হরিমোহন ঠিক এক কথায় রাজি হয়েছিলেন কি না জানা যায় না।

তবে 'সুরের ছোঁয়া' পূজোর আগেই প্রকাশিত হয়েছিলো। যে প্রেস থেকে নীলাম ইস্তাহার আর দাখিলা ছাপা হয় সেই প্রেস থেকে প্রথম কাব্য গ্রন্থ বেরিয়েছিলো। প্রথমে ভেবেছিলেন স্বামীকেই উৎসর্গ করবেন বইখানি। কিন্তু শেষে কেমন যেন লজ্জা করতে লাগলো। ছি ছি ছি, বাপ মার হাতে গিয়েওতো এ বই পড়বে। তাঁরা কি ভাববেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই লেখক দাদা নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকেই বইখানা উৎসর্গ করলেন সৌদামিনী। হরিমোহন এতে খুশী হ'লেন না, স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বললেন 'তবে যে বলেছিলে আমাকে দেবে। টাকা দিলাম আমি আর বই উৎসর্গ করলে সেই পাতানো দাদার নামে। আমার চেয়ে নগেন বাবুই তোমার কাছে বড়ো হলেন?' সৌদামিনী বললেন, 'ছি ছি ছি, ওসব কি বলছো। আমার চেয়ে বইখানাই তোমার কাছে বড়ো হ'লো? নিজেকে তো কোন্ জন্মে তোমার কাছে উৎসর্গ ক'রে রেখেছি।'

আবার জোয়ার লাগলো কাব্য চর্চায়। নতুন বই প্রকাশ করবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন সৌদামিনী। শহরের অনেকেই তাঁর বইয়ের প্রশংসা করেছেন। এমন কি কলকাতার কয়েকটি কাগজে পর্যন্ত সুখ্যাতি বেরিয়েছে। দ্বিতীয় বইখানি যাতে আরো পাকা হয় তার জন্যে নতুন উৎসাহে লেখা সুরু করলেন সৌদামিনী।

কিন্তু ততোদিনে পাঁচটি ছেলে-মেয়ে কোলে এসেছে তাঁর। তাদের মধ্যে একটি শুধু মাঝে মাঝে কোলে থাকে, গুটি তিনেক পিঠের কাছে বিরক্ত করে, আর একটি হামাগুড়ি দিয়ে ঘর আর বারান্দা চষে বেড়ায়। বাড়িতে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই যে···একটি চাকর অবশ্য আছে। আদালতের পিওন। সে বাজারটুকু সেরে কর্তার আগে আগেই কাজে বেরিয়ে যায়। সারাদিন সব এক হাতেই করতে হয় সৌদামিনীকে। রান্না, খাওয়া, ঘর-সংসার গুছনো, ছেলে-মেয়েদের নাওয়ানো ঘুমপাড়ানো—দ্বিভুজা সৌদামিনীর দশভুজা হ'তে পারলে যেন ভালো হয়। আর সেই ফাঁকে ফাঁকে চলে কাব্য রচনা। তার জন্যে দশ হাত নয়—শুধু একটি হাতের দরকার আর

একটিমাত্র মন—একাগ্র একনিষ্ঠ। দশদিকের দশরকমের চিন্তা কোথায় তলিয়ে যায়, ছেলে-মেয়ে স্বামী, সংসারের বাঁধন কখন যে আলগা হয়ে খসে পড়ে তা টের পান না সৌদামিনী। শুধু একটিমাত্র চেষ্টায় তন্ময় হয়ে থাকেন। কি ক'রে মনের কথাকে ছন্দের বাঁধনে বাঁধবেন। কানের মধ্যে যা গুনগুন করে, মনের মধ্যে যা গুনগুন করে, কি ক'রে সেই গুনগুনানিটুকু কলমের মুখে ভ'রে দেবেন।

একদিন সেই তন্ময়তার মুহূর্তে হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। দেড় বছরের মেয়ে হৈম হামাগুড়ি দিতে দিতে একেবারে গরম দুধের কড়ার মধ্যে গিয়ে পড়লো। চীৎকার শুনে কাগজ কলম ফেলে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন সৌদামিনী। মেয়েকে তুলে নিলেন কোলে। লবণ দিয়ে পোড়া জায়গাগুলি ঢেকে দিলেন। দুধ বেশি গরম ছিলো না এই যা রক্ষা। তবু শিশুর হাত পায়ের খানিকটা খানিকটা পুড়ে ফোস্কা পড়ে গেলো।

হরিমোহন বাড়ী ফিরে সবই জানতে পারলেন। তাঁর কাছে কোনো কথা গোপন রইলো না। কিছু গোপন করবার চেষ্টাও করলেন না সৌদামিনী। সব কথা স্বামীকে জানাবার পর বললেন, 'যা দুরন্ত হয়েছে ওরা।'

হরিমোহন গম্ভীরভাবে পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একজন একজন ক'রে পুড়িয়ে মারতে সময় লাগবে বড় বউ। তার চেয়ে এক কাজ করো। বাড়িতে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দাও। এক সঙ্গে আমরা সবাই পুড়ে মরবো। তোমার পদ্য লেখার আর কোনো বাধা থাকবে না।'

পাড়ার সবাই ব্যাপারটা জেনে গেলো। কেউ হাসলো, কেউ টিটকিরি দিলো। হৈমর পোড়া ঘা দিন পনেরোর মধ্যে শুকিয়ে গেলো। কিন্তু সৌদামিনীর মনের ঘা কিছুতেই শুকোতে দিলেন না হরিমোহন। ব্যঙ্গে বিদ্রূপে ঠাট্টায় পরিহাসে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তা কেবল বাড়াতেই লাগলেন। সৌদামিনী একদিন শেষে আর না থাকতে পেরে বললেন, 'তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আর কবিতা লিখবো না। তুমি আমাকে রেহাই দাও।'

তারপর আরও পাঁচটি ছেলে-মেয়ে হ'লো সৌদামিনীর। কিন্তু দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আর বেরোলো না।

রিটায়ার করবার পর কুমিল্লার বাসা তুলে দিয়ে হরিমোহন কলকাতায় চলে এলেন। ছেলেদের কর্মক্ষেত্র সেখানে, জামাই মেয়েরাও বেশির ভাগ কলকাতায় থাকে।

লেখা ছাড়লেন সৌদামিনী, কিন্তু পড়া ছাড়লেন না। এখন আর তাঁর ভাবনা কি। ছেলে-মেয়েরাই তাঁর বই জোগায়। শুধু কাব্য, উপন্যাস, গল্প নাটক নয় ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী—হাতের কাছে যা পান তাই পড়েন। মাঝে মাঝে নীলাম্বর তাঁকে ইংরেজী উপন্যাস বাংলা ক'রে শোনায়। বড়ো ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তিনি উপন্যাস নাটকের আখ্যান আর চরিত্র নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করেন। এক নতুন মহাকাব্যের, এক নতুন রসের রাজ্যের সন্ধান পেয়েছেন সৌদামিনী। সেই রাজ্যের বাইরে দাঁড়িয়ে হরিমোহন একা একা জ্বলতে থাকেন। এক একদিন বলেন, 'তুমি আমার ওপর শোধ নিচ্ছ বড় বউ, তাই না?'

সৌদামিনী হেসে বলেন, 'ওমা, এর মধ্যে আবার শোধ নেওয়ার কি দেখলে? তুমিও এসোনা, বসোনা আমাদের সঙ্গে।'

হরিমোহন বলেন, 'থাক থাক।'

ছেলে-মেয়েরা বড়ো হ'লো, পুত্রবধূরা এলো, জামাইরা এলো, নাতিনাতনী হওয়া শুরু করলে তবু ওঁদের মধ্যে ঝগড়ার শেষ হ'লো না। রুচির ব্যবধান, মতের ব্যবধান বেড়েই চললো। এখন আর কাব্য লেখা নিয়ে নয় অতি তুচ্ছ সামান্য কারণ নিয়ে, সাধারণ সাংসারিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া। নীলাম্বর মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ওঠে। কখনো মাকে ধমকায়, কখনো বাবাকে। বলে, 'তোমরা তোমাদের নাতিনাতনীদের চেয়েও অবুঝ হয়ে উঠলে দেখছি। বাজার থেকে আজ আলু না এনে পটল আনা হয়েছে। তাই নিয়ে তোমাদের এতো ঝগড়া?'

আসলে বিষয়টা উপলক্ষ, লক্ষ্য হ'লো কলহ। দাম্পত্য জীবনের তাই এখন ওঁদের একমাত্র যোগসূত্র।

মাঝে মাঝে পুরোপুরি অসহযোগ চলে। ছোট নাতিনাতনী নিয়ে আলাদা ঘরে থাকেন সৌদামিনী। ভিন্ন ঘরে হরিমোহনের ঘুম আসে না। বার বার ওঠেন, তামাক সাজেন আর তামাক খান। তাঁর হুঁকো টানার শব্দ শেষ রাত অবধি শোনা যায়। আর বাইরে থেকে সৌদামিনীর ঘরে দেখা যায় ক্ষীণ আলোর রশ্মি। নাতিনাতনীদের ঘুম পাড়িয়ে তিনি মৃদু দীপের আলোয় রাতের পর রাত বই পড়ে কাটাচ্ছেন।

কিন্তু এই বই পড়াতেও একদিন ব্যাঘাত ঘটলো, দুটি চোখেই ছানি পড়লো সৌদামিনীর। নীলাম্বর হাসপাতালে পাঠিয়ে অপারেশন করিয়ে আনলো। কিন্তু কি এক চিকিৎসা বিভ্রাটে দু'চোখের দৃষ্টিশক্তিই হারালেন সৌদামিনী।

হরিমোহন বললেন, 'বেশ হয়েছে। খুব মজা দেখছি আমি। এবার দেখবো কতো বই পড়তে পারো।'

মা'র জন্যে যখন তাঁর দোতলার সেই কোণের ঘরটায় বিছানা পাতবার ব্যবস্থা করছিলো নীলাম্বর, চটি পায়ে হরিমোহন এসে সামনে দাঁড়ালেন, সুরমাকে ডেকে বললেন 'বড়ো বউমা, বড়ো বউয়ের বিছানা একতলায় আমার ঘরে দাও।'

সুরমা একটু হেসে বললো, 'কিন্তু বাবা, আপনারা যে এক জায়গায় হলেই ঝগড়া করবেন।'

হরিমোহন বললেন, 'করি ক'রবো। তুমি ওকে একতলায় নামিয়ে দাও।'

সৌদামিনীর মত জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বললেন যে, তাঁর আপত্তি নেই, অন্ধের পক্ষে একতলার ঘরেই সুবিধে, বেশি ওঠা-নামা করতে হয় না।

অনেক দিন—অনেক বছর বাদে হরিমোহন আর সৌদামিনীর বিছানা একই ঘরে পাশাপাশি পড়লো, আগে নাতিনাতনীরা সৌদামিনীর কাছে থাকতো। এখন আর তারা রাত্রে তাঁর কাছে থাকতে চায় না। অন্ধ ঠাকুরমাকে দেখে তাদের ভয় হয়। হরিমোহনের কাছেও কেউ থাকে না, বুড়ো ঠাকুরদার মুখে তামাকের

গন্ধ। গা থেকেও কি রকম একটা বোটকা গন্ধ বেরোয়। এতোদিন বাদে ফের দু'জনে কাছাকাছি হয়েছেন। মাঝখানে আর কেউ নেই, একজন আর একজনের একমাত্র সঙ্গী। শেষের ছ'বছর সৌদামিনী এমনি অন্ধ অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। হরিমোহনের শরীরও ভালো যায় না, জরা তো আছেই, মাঝে মাঝে জরজ্বারিও হয়। একদিন কলতলায় পিছলে আছাড় খেয়ে পড়ে তিনিও শয্যা নিলেন। দু'জনেই অসুস্থ, দু'জনেই অশক্ত, তবু ওরই মধ্যে একজন আর একজনের সেবা করেন। সৌদামিনী স্বামীর কোমরে তেল মালিশ ক'রে দেন, চোখে না দেখলেও দিব্যি পান ছেঁচেন, তামাক সাজেন। আর হরিমোহন জীবনে যা কোন দিন করেন নি—বই পড়েন, পড়ে শোনান স্ত্রীকে। সেই ছেলেবেলায় পড়া বই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারত।

মাঝে মাঝে সংসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ লাগে। ভাইতে ভাইতে ঝগড়া হয়, জায়েতে জায়েতে কথা কাটাকাটি চলে। পুত্র পুত্রবধূর মধ্যে দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। দু'জনে শুয়ে শুয়েই মিটমাটের চেষ্টা করেন, এক আধটু ধমক দেন। কিন্তু কেউ শোনে না। আজ আর ওরা সংসার সমুদ্রের মাঝখানে নেই, তীরে এসে বসেছেন, সেখান থেকে বসে বসে দেখেন কতো ঢেউ ওঠে, কতো ঢেউ পড়ে, কতোজনে সাঁতরায়, কতোজনে হাবুডুবু খায়।

একটা শক্ত জ্বর থেকে ওঠার পর কানে ভারি খাটো হয়ে পড়েছেন হরিমোহন। জোরে চেঁচিয়ে না বললে কারও কথা শুনতে পান না। সৌদামিনী চেঁচান না, স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলেন। তিনি তো দেখতে পান না। কিন্তু ষোড়শী সপ্তদশী সব তরুণী নাতনীরা জানলা দিয়ে আড়চোখে দেখে আর মুখে রঙীন শাড়ীর আঁচল চেপে সরে যায়।

একদিন হরিমোহন বললেন, 'বড় বউ, তুমি আবার লেখো, পদ্য লেখো।'

সৌদামিনী হাসলেন, 'শোনো কথা, কি ক'রে লিখবো। আমার কি চোখ আছে?'

হরিমোহন বললেন, 'আমার তো দু'টো চোখ আছে বড় বউ। নিকেলের চশমা জোড়া পরলে আমি এখনও দিব্যি দেখতে পাই। আমি তোমার কলম, আমি তোমার মুহুরী। তুমি বলে যাও আমি লিখে নিচ্ছি।'

সৌদামিনীর দু'টি দৃষ্টিহীন চোখ থেকে জলের ধারা বেরোয়। হরিমোহন ব্যাকুল হয়ে বলেন, 'তুমি কাঁদছো কেন বড় বউ।'

সৌদামিনী বলেন, 'এ আমার দুঃখের কান্না নয় গো তুমি যে কবিতা আমাকে শোনালে তার চেয়ে ভালো কবিতা আমি কোনোদিন লিখতে পারি নি।'

হরিমোহন বললেন, 'তুমি দু'লাইন দু'লাইন ক'রে মিলিয়ে বলো, আগে তো পারতে।'

সৌদামিনী মাথা নেড়ে বললেন, 'এখন আর পারি না। চোখ যখন ছিলো, গোপনে গোপনে অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি, লেখা আর আসে না, কেবল কাটাকুটি, কেবল কাটাকুটি, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে আর পদ্য মেলাতে বলোনা।'

মৃত্যুর দু'দিন আগে সৌদামিনী স্বামীকে ডেকে বললেন, 'ওগো, সেই যে লেখার কথা বলেছিলে, লিখবে নাকি আজ?'

হরিমোহন কাগজ কলম নিয়ে জরাতুরা স্ত্রীর বিছানায় এসে বসলেন, ছেলেরা বউয়েরা নাতিরা নাতনীরা সবাই দোরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে গেলো সৌদামিনী বলছেন, আর হরিমোহন লিখে নিচ্ছেন, দুদিনের মধ্যে বলাও ফুরোলো না, লেখাও শেষ হ'লো না। দু'দিন পরে সব শেষ হলো।

সৌদামিনীর শেষ লেখা কবিতায় নয়, গদ্যে। অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামীর কম্পিত হাতের জড়ানো জড়ানো অসমান দুর্বোধ্যপ্রায় অক্ষরগুলির মধ্যে নিজের শেষ মনোভাব ব্যক্ত ক'রে গেছেন সৌদামিনী। তিনি লিখেছেন :—

"আমার কল্যাণীয়, কল্যাণীয়াগণ,

আমি আজ তোমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি। সে জন্য তোমরা কেউ দুঃখ করিওনা, একথা বলিব না। দুঃখ তো পাইবেই। ছাড়িয়া

যাইতে দুঃখ আমিও তো কম পাইতেছি না। নিজের চোখের জলের ভিতর দিয়া তোমাদের সেই কচি কচি মুখগুলি আমি ফের দেখিতে পাইতেছি। যে মুহূর্তে আমি চলিয়া যাইব জলভরা চোখে তোমরাও আমাকে নতুন করিয়া দেখিবে, নতুন করিয়া পাইবে। দুঃখের ভিতর দিয়া, ব্যাথার ভিতর দিয়া শৈশবের কৈশোরের কত মধুর কথাই না তোমাদের মনে পড়িবে। মনে পড়িবে আবার মন হইতে মিলাইয়াও যাইবে। ইহাই নিয়ম।

এ যাওয়া আমার বড় সুখের। সিঁথিতে স্বামীর সোহাগের সিঁদুর পরিয়া তোমাদের সুস্থ সবল কর্মরত দেখিয়া যাইতেছি। এমন যাওয়া সংসারে কয়জন যাইতে পারে। আমার কোন সাধই অপূর্ণ নাই। ছেলেবেলা হইতে সাহিত্য ভালবাসতাম, সুর ভালবাসিতাম, রং ভালাবাসিতাম। তোমরা এক একজন আমার এক এক সাধ মিটাইয়াছ। আমি তো নিজে কিছুই হইতে পারি নাই, করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি আমার নীলুর কলম দিয়া লিখিয়াছি, বিলুর আঙ্গুলে সুর সৃষ্টি করিয়াছি, দিলুর তুলি দিয়া ছবি আঁকিয়াছি, বেলা রমার কণ্ঠে গান গাহিয়াছি। তোমাদের সকলের ভিতর দিয়া আমি সব হইয়াছি, সব পাইয়াছি। কিন্তু যাওয়ার আগে আর একটি কথা যদি না বলিয়া যাই আমার সব অব্যক্ত থাকিবে। সে কথা আমি স্বামীর কাছেও গোপন করি নাই, তোমাদের কাছেও গোপন করিব না। সে এক হতভাগিনী বন্ধ্যা নারীর কথা, লেখিকা সৌদামিনীর কথা। যে তোমাদের ভিতর দিয়া সব পাইয়াছে সে তোমাদের মা। সে সেই সৌদামিনী নয়—যে একখানি কাঁচা বয়সের অপটু হাতের কবিতার বই রাখিয়া গেল ; আর কিছুই দিয়া যাইতে পারল না, আর কিছুই পাইয়া যাইতে পারিল না, তাহার দুঃখের শেষ নাই। তাহার দুঃখ কে ঘুচাইবে। স্বামীর প্রেমে যাহার পাওয়া হয় না, কৃতি সন্তানের সফলতায় যাহার ফললাভ হয় না, যাহাকে কেবল অক্ষর ধরিয়া ধরিয়া অক্ষর গুণিয়া গুণিয়া পাইতে হয় তাহার না পাওয়ার দুঃখ কে মিটাইবে বল।

তাই আমি বড় দুঃখ লইয়া যাইতেছি। এ যাওয়া আমার বড়

দুঃখের যাওয়া। শুধু সান্ত্বনা এই তোমরা প্রত্যেকেই শিল্পী, তোমরা প্রত্যেকই এ দুঃখ বুঝিবে, আর যশ অর্থ যতই পাও শিল্পে যখন স্বাদ জন্মিয়াছে হাজার পাওয়ার মধ্যে জীবনে ক্ষণে ক্ষণে তোমাদের না পাওয়ার দুঃখ পাইতে হইবে। কিন্তু সেই দুঃখকে ভয় করিও না। ভয় করিয়া আর এক দুঃখিনীর মত নিজের পথ ছাড়িয়া দিও না।"

ইতি—
আশীর্বাদিকা
শ্রীসৌদামিনী সেন

দিন সন্ধ্যার পর পাড়ার ডাক্তার নির্মল মিত্রের ডিসপেনসারিতে বসে গল্প করছিলাম। তখন রোগী-পত্তর বিশেষ ছিল না, কম্পাউণ্ডার অমূল্য ভিতরে কি যেন কাজ করছিল। আমরা সামনে বসে কথা বলছিলাম আর মাঝে মাঝে যাত্রী-ভরতি বাসের যাতায়াত দেখছিলাম। একটা বাস থেকে একজন যুবক নেমে এসে ডিসপেনসারিতে ঢুকলেন। কালো লম্বা ছিপছিপে চেহারা। বছর সাতাশ আঠাশ হবে বয়স। গায়ে একটা ছিটের শার্ট। তিনি এসে নির্মলের সামনের চেয়ারটায় বসলেন।

'কাল প্লেট তুলে এনেছি। অফিস থেকে সোজা রেডিয়োলজিস্টের কাছে গিয়েছিলাম। দেখ তো ডাক্তার কিছু ইমপ্রুভ করেছে কিনা।'

ডাক্তারের বয়সও তিরিশের নিচে। বুঝতে পারলাম আগন্তুক নির্মলের পরিচিত, হয়ত বন্ধুশ্রেণীর।

ডাক্তার প্যাকেট থেকে প্লেটখানি বের করে আলোর সামনে ধরলেন, আমি দেখলাম দু'দিকের দু'টি লাংসের এক্সরে নেওয়া হয়েছে। সাদা রেখাগুলিতে হাড়ের আভাস। ডাক্তার খানিকক্ষণ প্লেটটা দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, অনেকখানি হিল আপ হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা আমি স্পেশালিস্টের কাছে কাল ভোরেই পাঠিয়ে দেব। রিপোর্ট তুমি কাল ঠিক এই সময় পাবে। মনে হচ্ছে এখন থেকে উনি তাড়াতাড়িই ভালো হয়ে উঠবেন।'

ডাক্তারের বন্ধুটি প্রশ্ন করলেন, 'সত্যি বলছ তো ডাক্তার ভালো হবে? সেরে উঠবে তো? শুধু গলার স্বরে নয়, তাঁর চোখে মুখেও উদ্বেগ প্রকাশ পেল। ডাক্তার বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, গোড়ার

দিকে ধরা পড়েছে, প্রথম থেকে চিকিৎসা চলছে, নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন। তুমি কিছু ভেব না সরোজ।' চিকিৎসা সম্বন্ধে আরো দু' একটা কথা বলে একটু বাদে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

আমি বললাম, 'ওকে যেন চেনাচেনা মনে হচ্ছে।'

নির্মলবাবু বললেন, 'বাঃ চিনবেন না কেন। সরোজ সান্যাল পাড়ার ক্লাবের একজন পাণ্ডা গোছের লোক। চাঁদাটাঁদা চাইতে আপনাদের বাসায় নিশ্চয়ই গেছে দু' একবার।'

বললাম, 'তা বোধ হয় গেছেন। তা ছাড়া আরো দেখেছি ওঁকে। কিছুদিন আগে এই টালা পার্কে ওঁকে প্রায়ই দেখতাম, রাত্রেও দেখেছি। একা নয়। ওঁর সঙ্গে—'

আমাকে থেমে যেতে দেখে নির্মলবাবু একটু হাসলেন, 'ওর সঙ্গে একটি মেয়েকেও দেখেছেন, এই তো? লেখক মানুষ কিনা, লোকের চাইতে তার সঙ্গিনীর দিকেই আগে চোখ পড়ে।'

হেসে বললাম, 'আর উকিল ডাক্তাররা বুঝি চোখ বুজে চলাফেরা করেন।'

নির্মলবাবু বললেন, 'তা কেন। তবে আপনাদের মত আমাদের কি অত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে কল্যাণ বাবু! তবে হ্যাঁ, অস্বীকার করব না। সরোজকে সেই মেয়েটির সঙ্গে যখন তখন বায়ুসেবন করতে আমরা অ-লেখকরাও দেখেছি। লক্ষ্য করে থাকবেন বোধ হয় প্রথম প্রথম মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না। মানে, তখন পূর্বরাগের পালা চলছিল। সিঁদুরের রক্তরাগ পড়েছে এই সেদিন মাস পাঁচেক আগে। আরে মশাই, সেই নিয়েই তো যত গণ্ডগোল।'

বললাম, 'ব্যাপারটি কি, যদি বাধা না থাকে, গোড়া থেকে বলুন।'

নির্মল ডাক্তার শুরু করলেন ঃ

"বাধা আর কিসের, তবে মশাই গল্প লেখার সময় আমার নামটাম জড়িয়ে দেবেন না। ওরা আমাদের প্রতিবেশী। ওই অনাথ দেব লেনেই বাসা, নেক্স্ট ডোর না হলেও দু'তিন দরজার পরেই ওদের বাড়ি। সরোজের বাবা অনাদি সান্যালকেও আপনি দেখেছেন, ওই যে লম্বা ফর্সামত ভদ্রলোক। আজকাল শ্যামবাজার স্টোর্সে

আছেন। আর আমাদের সরোজও অল্পবয়স থেকেই চাকরি করে। মিশন রোয়ের রায় এণ্ড রায় কোম্পানীতে। তা চাকরি বাকরি করলে কি হবে, বাপ আর ছেলের মধ্যে মনোমালিন্য গত ছ' সাত বছর ধরেই চলছিল। প্রথম প্রথম মাইনের পুরো টাকাটা সরোজ তার মার হাতে এনেই ধরে দিত, কিন্তু বছর দুই পর থেকে ওর মতিগতি কিরকম পালটে গেল। পুরো টাকা আর দেয় না। কোন মাসে অর্ধেক দেয়, কোন মাসে তারও কম। মাসের শেষে চেয়ে চিন্তে দু' পাঁচ টাকা ওর মা কখনো পান, কখনো পান না।

অনাদিবাবু প্রথম প্রথম জিজ্ঞাসা করতেন, 'বাকি টাকা কি করলি।'

সরোজ জবাব দিত, 'খরচ হয়ে গেছে।'

সরোজের মা ফের জেরা করতেন, 'কিসে এত খরচ হলো?'

এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ সরোজ পছন্দ করত না। সে বলত, 'বাঃ, আমার নিজস্ব খরচ বলে কিছু থাকতে নেই নাকি? ট্রাম বাস টিফিন ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম—'

ওর মা বলতেন, 'সবই তো বুঝলুম বাপ্। কিন্তু অর্ধেক মা ষষ্ঠী আর অর্ধেক বাকি গোষ্ঠী হলে তো চলে না, যার সাতসাতটি ভাই বোন তার পকেট-খরচের জন্যে অত টাকা নিলে চলে কি করে। যার মাথার উপর এত দায়িত্ব—'

সরোজ বলত, 'আমার কোন দায়িত্ব নেই। দায়িত্ব তোমাদের দু'জনের।'

ওর মা লজ্জায় কথা বলতে পারতেন না, অনাদি বাবুর কাছে গিয়ে নালিশ করতেন, 'শোন, তোমার লেখাপড়া-জানা ছেলের কথা শোন।' অনাদিবাবু বলতেন, 'আরে স্কুল কলেজে পড়িয়েছি বলেই তো এই খোঁটা দিতে পারছে। যদি মূর্খ করে রাখতুম তা' হলে কি আর দিত?'

এমনি করেই চলছিল। প্রায়ই ওদের বাসায় ঝগড়া-ঝাঁটি লেগে থাকত। বাপ-ছেলের মধ্যে লাগত, মা-ছেলের মধ্যে লাগত। যখন মুখ ছুটত কারোরই আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকত না। সম্পর্কের বাদ-বিচার থাকত না।

সরোজ বাইরে কিন্তু খুব ভালো ছেলে। বেশ আলাপী, ভদ্র, চালাক চতুর আর ক্লাব-অন্ত প্রাণ। ক্লাবের খেলাধুলো, গান বাজনার জলসা, সার্বজনীন দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো সব ব্যাপারেই ও আছে। দরকার হ'লে খাটতেও পারে যথেষ্ট। ক্লাবের পিছনে নিজের গাঁটের টাকাও বেশ ব্যয় করে।

এমন ছেলের পারিবারিক সম্পর্ক অত খারাপ হয় কেন আমি ভেবে পেতাম না। মাঝে মাঝে ওকে ডেকে বলতাম, 'সরোজ কেন বাপ-মা'র সঙ্গে অমন ঝগড়া-ঝাঁটি কর। লোকে কি বলে।'

সরোজ জবাব দিত, 'তুমি বুঝবে না নির্মল। বাপ-মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু দেনাদার পাওনাদারের। আর কোন সম্বন্ধ নেই। রাতদিন কেবল টাকা আর টাকা। আমার মা আমার বেলায় একটি টাকা রোজগারের কল প্রসব করেছিল। ওরা আশা করে সেই কল থেকে মাসভরে কেবল টাকা বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি বন্ধ হলেই সব বন্ধ। আমি কোন হোটেল-টোটেলে গিয়ে উঠব ভেবেছি। অত আর সহ্য হয় না।'

ও পক্ষের সঙ্গেও আমার কথাবার্তা হতো। অনাদি বাবুকে বলতাম, 'মেশোমসাই, ছেলের সঙ্গে অত ঝগড়াঝাঁটি কিসের আপনার। ও তো শরিক নয়, আপনার ছেলে। রাতদিন কেন অমন করবেন।'

অনাদি বাবু বলতেন, 'আরে বাবা বাইরে থেকে তুমি কিছু বুঝবে না। ও যে একখানা কি চীজ তা আমরা টের পাচ্ছি। সংসারের কারো সুখ দুঃখ দেখবে না, ভাই বোনগুলির দিকে তাকাবে না। অন্যে পরে কা কথা—নিজের মায়ের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করে—নিজের গর্ভধারিণী মা—।'

অনাদিবাবু আর তার স্ত্রীর অভিযোগ, সরোজ সংসারে খুবই কম টাকা দেয়। আর সরোজের নালিশ, বাপ মা তার কাছ থেকে যথেষ্ট পেয়েও স্বীকার করে না। বরং পাড়া পড়শীর কাছে মিথ্যে বদনাম দিয়ে বেড়ায়। সরোজ আমাকে বলত, 'ডাক্তার তুমি আমার পার্সনাল নোটবুকটা দেখ, তাতে আমার আয়ব্যয়ের হিসাব

বুঝতে পারবে।' এর জবাবে সরোজের বাবা মা তাঁদের সাংসারিক জমা-খরচের খাতা আমাকে দেখাতে চাইতেন।

সরোজ বলত, 'ও খাতায় আমি বিশ্বাস করিনে। আমি যা দিই তা ঠিক ঠিক ও খাতায় লেখা হয় না। ও এক জাল খাতা।'

হিসেব রাখেন সরোজের মা সুধারাণী। তিনি ছেলের কথায় চীৎকার করে বলতেন, 'আমি জালিয়াতী করছি! আমার খাতা নাকি জাল খাতা। আমি মা নয় তোর?' সরোজ জবাব দিত, 'মা না জাল মা কে জানে।'

আমরা বন্ধু-বান্ধবরা বললাম, 'মাসীমা, সরোজের এবার বিয়ে থা দিন, তা হলে বোধ হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাসীমা বলতেন, 'আমরা তো চেষ্টা করছি বাবা। কিন্তু ছেলে কথা শোনে কই।'

সরোজ বলে, 'ক্ষেপেছ, এ সংসারে আমি আবার বিয়ে করব? যা শান্তির সংসার আমাদের।'

সরোজ বাড়ী থাকে খুব কম। বেলা আটটায় উঠে ক্লাবে চলে আসে। দোকান থেকে চা আনিয়ে খায়। কাগজ পড়ে। অফিসে যাওয়ার আগে বাড়ী থেকে দুটি খেয়ে বেরোয়। আর ফের এসে খায় রাত বারোটা একটায়। এই নিয়েও ঝগড়া হয়। ওর মা বলেন, 'আমি এমন দাসী বাঁদী আসিনি যে তোর জন্যে রাত বারটা পর্যন্ত ভাত নিয়ে জেগে থাকব। আমি আর পারব না।' সরোজ সোজা জবাব দেয়, 'বেশ তো, না পারো সে কথা স্পষ্ট বলে দাও। আমি কাল থেকে হোটেলে চলে যাব। আর এও তো একটা হোটেল ছাড়া কিছু নয়।' কথাটা আস্তেই বলছিল সরোজ, কিন্তু অনাদিবাবু ঠিক শুনে ফেললেন।

রুখে গিয়ে দাঁড়ালেন ছেলের সামনে। চেঁচিয়ে বললেন, 'কি বললি।'

'যা বলেছি আপনি তো শুনেছেনই।'

অনাদিবাবু বললেন, 'হাঁ শুনেছি। যে ছেলে বাড়িকে হোটেল, বাপকে হোটেলওয়ালা আর মাকে হোটেলওয়ালী বলে, আমি তার মুখ দর্শন করতে চাইনে। যাও, বেরোও এ বাড়ি থেকে।'

সরোজ বলল, 'আপনি যখন তখন অমন বেরোও বেরোও বলবেন না বলে দিচ্ছি। এ বাড়ী আপনার বাবার বাড়ী নয়, নিজের করাও না, ভাড়া বাড়ী। ভাড়া যা দেওয়া হয়, তাতে আমার রোজগারের অংশও আছে। একথা মনে রাখবেন।'

আমি জোর করে সরোজকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম। বললাম, 'ছি ছি ছি কি করছ সরোজ।'

শুধু আমার সামনেই নয়, পাড়ার অন্য সব বন্ধুদের সামনেও ওদের এমন ঝগড়া বিবাদ হয়। ওদের এই পারিবারিক কলহ কেলেঙ্কারী নিয়ে পাড়ায় নানা রকম আলোচনা সমালোচনা হয়। কেউ হাসে, কেউ পরিহাস করে। কিন্তু ওদের যেন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

এর মধ্যে দু'তিনটি ভালো ভালো সম্বন্ধ এলো সরোজের। ওর মামাই গরজ করে আনালেন। একটি হাটখোলার লাহিড়ীদের আর একটি বউবাজারের বাগচীদের মেয়ে। মাসীমার অনুরোধে আমরা বন্ধুরা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে একটি মেয়েকে দেখেও এলাম, আমাদের পছন্দও হলো। কিন্তু সব সম্বন্ধই নাকচ করে দিল। বলল, 'আমার জন্যে তোমাদের কাউকে ভাবতে হবে না।'

তারপর আরো মাস ছয়েক বাদে হঠাৎ একদিন শুনলাম, সরোজ একটি কায়স্থের মেয়েকে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছে। মেয়েটি যে কে তাও জানতে পারলাম। বেলগাছিয়ার রাজেন দের মেয়ে রেণু দে। আমার মনে পড়ল, রেণু আমাদের পাড়ার ক্লাবের ফাংশন-গুলিতে দু'তিন বছর ধরে নিয়মিত যোগ দিচ্ছিল। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী। গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা। চমৎকার আবৃত্তি করে। সেবার কচ-দেবযানীতে দেবযানীর অংশ আবৃত্তি করে মেডেল পেয়েছিল। ওর বাবা স্মল কজ কোর্টের উকিল। রেণু কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে। এরই মধ্যে এই কাণ্ড। কি ক'রে ওদের আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা হলো তা আমি জানিনে মশাই, তা আমি বলতেও পারব না। আপনারা লেখক মানুষ, ও সব মধুর রসের ব্যাপার অনুমান করে নেবেন, কল্পনা করে নেবেন। আমি শুধু ওর বাস্তব ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।

অবশ্য মাঝে মাঝে সরোজ আর রেণুকে একসঙ্গে আমিও যে না দেখেছি তা নয়। বাসে ট্রামে পাশাপাশি বসে যাচ্ছে, কি পার্কে এক সঙ্গে বেড়াচ্ছে, এমন দৃশ্য আমারও চোখে পড়েছে। কিন্তু আমাদের চোখ তো আপনাদের মত গল্প দেখার চোখ নয় যে, দুজন তরুণ-তরুণীকে এক সঙ্গে দেখলেই একটি কাহিনী অনুমান করে নেব! তা ছাড়া সরোজ কোনো-বার ক্লাবের সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়, কোনো-বার বা ভাইস প্রেসিডেণ্ট। সভাসমিতি ফাংশন-টাংশনের ব্যাপার নিয়ে অনেক মেয়ের সঙ্গেই ও মেশে। কারো ওপর ওর কোন দুর্বলতা আছে এমন কথা কাউকে বলতে শুনিনি। তাই হঠাৎ সরোজ যে এ ধরনের একটা কাণ্ড করে বসবে আমরা কেউ ধারণা করতে পারিনি। আমরা অবাকই হলাম।

আমরা অবাক হলেও পাড়ার সবাই নির্বাক রইল না। এই নিয়ে রোয়াকে বৈঠকখানায় চায়ের দোকানে নানা রকম খোসগল্প চলতে লাগল। আমার এই ডিসপেনসারিটুকুও বাদ গেল না। রেণুর বাবা মা শাসালেন তাঁরা পুলিস কেস করবেন। তাঁর বাড়িতে সরোজ কিছুতেই ঢুকতে পারবে না। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে উকিলবাবু শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হলেন। মক্কেলদের বেলায় এসব ব্যাপারে তিনি মামলা করতে প্ররোচনা দিলেও নিজের বেলায় আদালতের দ্বারস্থ হওয়া তিনি সঙ্গত মনে করলেন না। সাক্ষীসাবুদ রেখে বিয়ে ওরা করে ফেলেছে। তাঁর মেয়েও ছোট নয়, উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পড়েছে;—সে যদি স্বেচ্ছায় স্বামী বেছে নিয়েই থাকে তা নিয়ে হৈ চৈ না করাটাই বুদ্ধিমান বাপের লক্ষণ। হৈ চৈ করলেন না বটে তবে স্পষ্টই বলে দিলেন, ও মেয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। প্রথম মেয়ে, সুন্দরী, কলেজে পড়ছে, কত ভালো ঘরে বরে তিনি ওকে দেবেন আশা করে রয়েছেন। সেই শুভদিনের জন্য টাকা জমাচ্ছেন, গয়না গড়াচ্ছেন। এর মধ্যে মেয়ে কি কাণ্ড করে বসল। ওই জাতেই বামুন, তা ছাড়া সরোজের আর কি আছে। বিদ্যা বিত্ত রূপ—কিসে ও বরণীয়।

শ্যামবাজারে ওর এক বন্ধুর বাড়িতে সরোজ সস্ত্রীক সপ্তাহ খানেক

রইল। তারপর আর এক বন্ধুকে বাপের কাছে দূত হিসেবে পাঠাল। যদি সত্যিই তিনি সরোজকে বাড়িতে ঢুকতে না দেন তা হলে সে আলাদা বাসা করে থাকবে। বাড়িতে একটি পয়সাও দিতে পারবে না।

অনাদিবাবু চট করে জবাব দিতে পারলেন না। পঞ্চাশ টাকা বাড়িভাড়া গুণতে হয়, ছেলেমেয়েদের স্কুলের মাইনে আছে, তাদের পোশাক-আশাক আছে, সব যদি তাঁর একার ঘাড়ে পড়ে, সংসার চালানো সত্যিই কষ্টকর হয়ে উঠবে। সরোজের পর দুটি মেয়ে। তাদের বিয়ে দিয়েছেন। সেই দেনার টাকা এখনো শোধ হয়নি। কানু বেণু টুনি রুনিরা সবাই ছোট। হাফপ্যাণ্ট আর ফ্রকের দলে। কিন্তু ওই জামা কাপড়ের খরচটাই পুরোপুরি লাগে না, আর কোন বেলায় হাফটিকিটের স্থবিধে নেই।

তাঁকে দ্বিধাগ্রস্থ দেখে আমরা বন্ধুরা চেপে ধরলাম, অনুরোধ উপরোধ করে বললাম, 'ছেলে বউকে ঘরে তুলে নিন মেশোমশাই, যা হবার তা হয়ে গেছে। বাড়ির বড় ছেলে ভাই বোনদের ফেলে আলাদা করে থাকবে সে কি ভালো দেখায়।'

মাসীমা বললেন, 'তাই বলে কায়েতের মেয়েকে—'।

আমরা বললাম, 'তাতে আর কি হয়েছে। শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন বিয়ে আজকাল আকছার হচ্ছে।' নাম ঠিকানা উল্লেখ করে আমাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের ভিতর থেকে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ বিয়ের অনেক দৃষ্টান্ত আমরা দিলাম ওঁদের কাছে। মাসীমা বললেন, 'বেশ আসতে চায় আসুক। কিন্তু ও বউ আমার হেঁশেলে ঢুকতে পারবে না তা বলে দিলুম বাপু।'

আমরা সরোজকে বললাম, 'বাড়ির ভিতরে ঢুকে তো পড়, তার পর বউয়ের হেঁশেল বউ নিজেই ঠিক করে নেবে। কলেজ আছে ক্লাব আছে তোমার বউয়ের, কিছু দিন হেঁশেল না থাকলেও কিছু এসে যাবে না।'

সরোজও তাই মনে করল। বাড়িতে একবার ঢুকতে পারলে আর কোন অসুবিধে হবে না। দু'দিন বাদে সব ঠিক করে নিতে পারবে।

দেখলাম নতুন বাসা করার চেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে পুরানো বাসায় আসার গরজই সরোজের বেশি। বাপ মায়ের সঙ্গে থাকতে পারবে সেই লোভে নয়। সে যা-ই কিছু করুক, বাপ যে তাকে বের করে দিতে পারে না, বাসার ওপর তারও যে সমান পরিমাণ অধিকার আছে, সে কথা পাড়াপড়শীর কাছে বন্ধুদের কাছে জাহির করতে হবে বলে। তা ছাড়া এ পাড়ায় তার দ্বিতীয় কর্মভূমি ক্লাব থাকায় এ জায়গা ছেড়ে সে নড়তে চায় না।

যা হোক, সরোজ স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে তো গেল। ও প্রথম থেকেই বারণ করে দিয়েছিল কোন রকম আচার অনুষ্ঠান যেন না হয়। হিন্দুয়ানীর নামে স্ত্রী-আচারের নোংরামি সে পছন্দ করে না। কিন্তু তাই বলে নতুন বউ নিয়ে বাড়িতে এল, একবারও কেউ শাঁখ বাজাবে না, হুলুধ্বনি দেবে না, এই বা কেমন। এতখানি অসহযোগিতাও সরোজের ভালো লাগল না। রীতিমত অপমান বলেই বোধ হলো।

পাড়াপড়শীরা বলল, 'এতটা বাড়াবাড়ি আবার ভালো না। ছেলে বউকে যখন ঘরেই নিলে সরোজের মা, তখন একটু কিছু তোমার করা উচিত ছিল। অন্তত একটা শাঁখের ফুঁ এক ঝাঁক উলু দিলে কি সিঁদুর পরিয়ে একখানা শাড়ি আর ধান দূর্বা দিয়ে বউকে আশীর্বাদ করলে সেটা একেবারে দোষের হত না।'

এসব কথার পশ্চাতে সরোজের মা বললেন, 'ওরা তো হোটেলে এসেছে। হোটেলে কি ওসব ব্যবস্থা থাকে ?'

মাসখানেক বাদে একদিন সরোজের বাড়ির সামনে দিয়ে ডিসপেন্সারিতে আসছি, দেখি মাসীমা সদরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ হবে বয়স। কিন্তু দেখে অনেক বেশি মনে হয়। পর পর বহু সন্তান হওয়ায় শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। সবগুলি ছেলে মেয়ে অবশ্য বেঁচে নেই। কিন্তু জন্মমৃত্যুর জের তারা রেখে গেছে ওঁর দেহের ওপর। একখানা লালপেড়ে আটপৌরে আধময়লা মিলের শাড়ি পরনে। হাতে দু'গাছি শাঁখা। সংসারের কাজের

ফাঁকে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছেন। দরজার একটি পাল্লার ফাঁক দিয়ে বাইরের জগতের কতটুকু দেখছেন কি দেখছেন কে জানে।

দেখুন কল্যাণবাবু, আমরা ডাক্তার মানুষ, সব সময় রোগীপত্তর ওষুধ ইনজেকসন ডিসপেনসারি হাসপাতাল নিয়ে ব্যস্ত থাকি। মানুষের দেহের রোগের চিকিৎসা করা আমাদের ব্যবসা। তাদের মনের দিকে তাকাবার ফুরসৎ কমই পাই। সেই মনও থাকে না, সেই চোখও থাকে না। কিন্তু হঠাৎ মাঝে মাঝে একেক মুহূর্তে একেকটি ছবি এমন ভাবে চোখে পড়ে যায় যে মন থেকে কিছুতেই তা আর মুছে ফেলা যায় না। সরোজের মার সেই অবসন্ন ভাবে, শূন্য দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যটি আমি আজও ভুলতে পারিনি।

আমাকে দেখে তিনি ডেকে বললেন, 'নির্মল একবার শুনে যাও। আমি তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি।'

বললাম, 'কেন মাসীমা, বাড়িতে কি কোন অসুখ বিসুখ আছে?'

মাসীমা একটু হাসলেন, 'না বাবা, অসুখ বিসুখ কিছু নেই। খুব সুখে আছি আমরা। আমাদের সুখ তো তোমরা দিনরাত দেখছ শুনছ।'

বউ নিয়ে ঘরে আসবার পরে সরোজের সঙ্গে ওদের ঝগড়া-ঝাঁটি কমেনি, আরো বেড়েছে। এ খবর প্রায় রোজই আমাদের কানে এসে পৌছিল। আগে সরোজ ছিল একা। এখন তার পক্ষ নিয়েও কথা বলবার মানুষ জুটেছে। নতুন বউ শাশুড়ীর মত চড়া গলায় চীৎকার করে না, কিন্তু ইংরেজী মিশিয়ে এমন শ্লেষ ক'রে ক'রে কথা বলে যে তার প্রত্যেকটি অক্ষর বিষাক্ত তীরের মত গিয়ে বুকে বেঁধে সরোজের বাপ মার। কলেজে পড়া কায়েতের মেয়ে তো এই জন্যেই ঘরে এনেছে সরোজ, তার বাবা মার সঙ্গে যুঝতে পারবে বলে। রেণু সরোজের হাতের ব্রহ্মাস্ত্র। একই সঙ্গে অগ্নিবাণ আর বরুণ বাণ।

বললাম, 'মাসীমা, কেন আর অমন করছেন। এবার মিলে মিশে ঘর সংসার করুন। আপনার ছেলে, আপনার বউ।' মাসীমা বললেন, 'আমার ছেলে আমার বউ, একথা তোমার মুখ থেকে

আমাকে শুনতে হচ্ছে বাবা। না, ওরা আমার কেউ নয় নির্মল। ওকে যে আমি পেটে ধরেছি, খাইয়ে পরিয়ে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, ওর মুখের দিকে চেয়ে কত আশা করেছি, তা আমি সব ভুলে গেছি।' মাসীমার কোটরে বসা চোখ দুটি জলে ভরে উঠল।

তারপর মাসীমা আস্তে আস্তে আরো অনেক কথা বললেন। টাকা পয়সা নিয়ে এখনো গোলমাল করে সরোজ। সব টাকা দেয় না, বলে, 'আমরা যখন হোটেলেই আছি, হোটেলের মতই ব্যবহার পাচ্ছি সবাইর কাছ থেকে, তখন হোটেলের খরচই দেব। ঠিক দু'জনের থাকা খাওয়া বাবদ যা লাগে তার চেয়ে একটি পয়সাও বেশি দেব না। আমার বউ যখন এ বাড়িতে বউয়ের মর্যাদা পেল না, আমিও বুঝে নেব, আমিও দেখে নেব তুমি কেমন শাশুড়ী।'

বাপ-মাকে উপেক্ষা করে দু'জনে দিনের বেলায় ঘরে দোর বন্ধ ক'রে হাসে গল্প করে; বিকেল বেলায় সেজে গুজে চোখের সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, একবার ব'লে যাওয়ারও দরকার বোধ করে না। ভাইবোনদের জামা নেই, প্যাণ্ট নেই, স্কুলের মাইনে বাকি পড়েছে, সংসারের খরচ চলে না, কিন্তু স্ত্রীকে নিয়ে বেড়ানো-চেরানো সিনেমা থিয়েটার দেখার বিরাম নেই সরোজের।

মাসীমা শেষে বললেন, 'এসব তো আর সইতে পারিনে বাবা। আমি ভিক্ষে ক'রে খাব সেও ভালো, তবু ওর মুখ আমি আর দেখতে চাইনে। তোমরা বলে দাও ওর সোহাগের বউ নিয়ে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাক। আমার কপালে যা আছে তাই হবে। আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।'

খানিক বাদে জরুরী রোগী দেখার নাম ক'রে ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম বটে, কিন্তু মনটা ভারি বিমর্ষ হয়ে রইল। বাপ মায়ের সঙ্গে ছেলে, ছেলের বউয়ের ঝগড়াকে এতদিন তেমন গুরুত্ব দিইনি। দূর থেকে মনে হতো এ যেন চায়ের কাপে ঝড়। কিন্তু আজ একটু কাছ থেকে দেখলাম। দেখলাম চায়ের কাপের মধ্যেও সেই একই সমুদ্রের প্রচণ্ডতা, সে কাপ যখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তার আওয়াজ ছোট হলেও কাপটির পক্ষে ভেঙে পড়ার সর্বনাশ তুচ্ছ নয়।

সরোজকে দু'চার কথা বললাম। মন্দই বললাম, 'ছি ছি ছি এসব কি তোমার উচিত হচ্ছে সরোজ।' সরোজ বললো, 'ডাক্তার ডাক্তারী নিয়ে আছ, বেশ আছ, কেন তার বাইরে পা বাড়াও। তুমি কি ভেবেছ, তোমার এই স্টেথিস্কোপ কানে দিয়ে সব কথা শোনা যায়? সংসারে সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কি জানো?'

বললাম, 'কি'।

সরোজ বলল, 'মৃত্যু নয় জন্ম, সবচেয়ে বড় দুঃখের ব্যাপার হলো নিজের বাপ-মাকে মানুষ নিজের হাতে বেছে নিতে পারে না। তার জন্যে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। সে যে কত বড় দুর্ভাগ্য তা যে ভোগে সেই বোঝে।'

আর একদিন সন্ধ্যার একটু আগে ডিসপেনসারিতে আসবার আগে পার্ক দিয়ে একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেখি একটি মেয়ে একেবারে জলের কাছে গিয়ে একা একা চুপ চাপ বসে আছে। ঝিলের উল্টো দিকে যেতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। সরোজের স্ত্রী রেণু, মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী! তার গায়ে গয়না বেশি কিছু নেই। হাতে দু'গাছি করে চুড়ি, আর কানে দুটি ফুল। পরনে অল্পদামী একখানা শাড়ি। শুনেছি বাপমার বাড়ি থেকে কিছুই সে নিয়ে আসেনি। গায়ের গয়নাগুলি পর্যন্ত খুলে রেখে এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছে। এই মেয়েটিকে তো কতবার কতভাবে দেখেছি। স্টেজের ওপরে ওর সেই আবৃত্তি, পুরস্কার পাওয়ার পর ওর সেই আত্মপ্রসাদ, একটু বা অহঙ্কারদীপ্ত মুখের ভাব আমার চোখে পড়েছে। ছেলেই হোক, মেয়েই হোক, অন্যের অহঙ্কার তেমন শোভন লাগে না, তা বোধ হয় মানেন; কিন্তু সেদিন সেই সন্ধ্যার ছায়ায় আমার মনে হলো ও যেন এক বিষণ্ণ জলদেবী। জল থেকে ভুলে উঠে এসেছে, ফের যেন আবার জলের মধ্যেই মিলিয়ে যেতে চায়। ঘুরে আসতে ও মুখ ফিরিয়ে আমাকে ডাকল, 'নির্মলদা, এখানে আসুন।'

কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'সরোজ আসেনি?'

রেণু বলল, 'না। তিনি তো অফিসে।'

হেসে বললাম, 'তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছ বুঝি?'

রেণু একটু আরক্ত হয়ে বলল, 'না, তাঁর আজ ফিরতে অনেক রাত হবে। অনেক অ্যারিয়ার জমেছে—'

বললাম, 'একা একা এসেছ।'

রেণু বলল, 'তাই এলাম। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের ডাকিনে। আমার সঙ্গে মিশলে ওরা শাস্তি পায়। কি দরকার।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'ভেবেছিলাম তুমি অ্যাডযাস্ট করে নিতে পারবে।'

রেণু জলের দিকে তাকিয়ে দুটি একটি করে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, 'আমিও তো তাই ভেবেছিলাম। দেখুন ওঁরা পছন্দ করবেন না বলে কলেজে পড়া বন্ধ করলাম। প্রাইভেট পরীক্ষাই দেব। ভাবলাম সেবায় শুশ্রূষায় ওঁদের মনের রাগ যাবে। কিন্তু সেবা করব কি কাছেই যে ঘেঁষতে পারিনে। আমাকে কোন কিছু ছুঁতে দেন না, ধরতে দেন না, আবার কাজ করিনে বলে রাগ করেন। কত খোঁটা দেন। ভেবেছিলাম মতের অমিলে বাপ-মাকে ছেড়ে এলেও ওঁদের মধ্যে নিজের বাবা মাকে পাব। চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু হলো না।'

বললাম, 'এখনই আশা ছাড়বার কি হয়েছে।'

রেণু বলল, 'আশা আর রাখতে পারছিনে নির্মলদা। মাঝে মাঝে মনে হয় দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। তাই আজ এক ফাঁকে পালিয়ে চলে এসেছি। বাপের বাড়ি থাকতেও নেই, আত্মীয় স্বজন ঠাট্টা তামাশা করবে বলে তাদের কারো বাড়িতে যাইনে। কোথাও যেতে ভালোও লাগে না।'

বললাম, 'শুনেছি সরোজ খুব বেড়াতে টেড়াতে নিয়ে বেরোয়।'

রেণু একটু হাসল, 'ওরা বলেছেন বুঝি। হ্যাঁ বেড়াতে বেরোন, কিন্তু আগের মত আনন্দ আর নেই। আমরা দু'জনে এক জায়গায় হলেই ওঁদের দু'জনের কথা উঠে পড়ে। সেই নিন্দে মন্দ, খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া বিবাদের কথা। তুলতে চাইনে। তবু যেন কি ভাবে ওঠে। তা ছাড়া আপনার বন্ধুও দিন দিন যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছেন। ওই উগ্র মূর্তি আমার আর ভালো লাগে না। মাঝে

মাঝে আমার কি মনে হয় জানেন—এ বিয়ে যেন না হলেই ভালো হতো।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'যখন বনিবনাও একেবারেই হচ্ছে না, তখন তোমাদের পক্ষে বোধ হয় আলাদা হয়ে থাকাই ভালো।'

রেণু বলল, 'কথাটা আপনি বললেন তাই। আমার মুখ থেকে শোনালে খারাপ লাগত। মাঝে মাঝে আমিও তাই ভাবি। এমন ছাড়াছাড়া ভাবে একসঙ্গে থেকে লাভ কি।'

কিন্তু সরোজের জেদ সেও বাসা থেকে নড়বে না। সরে যেতে হয় অনাদি বাবু সরে যান। সরোজ যাবে না।

মাঝে মাঝে দু'পক্ষের কথা বন্ধ থাকে। যেন কেউ কাউকে চেনে না। কারো সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক নেই। আবার দু'দিন বাদে এই অস্বাভাবিক নীরবতার পর এই অস্বাভাবিক রব শুরু হয়। ওঁদের বাড়ির ঝগড়া-ঝাঁটির জ্বালায় রাস্তার লোকের কান ঝালাপালা হয়ে যায়।

এমনি একটা ঝগড়ার দিন বেলা প্রায় এগারটার সময় আমাকে পথ থেকে টেনে নিয়ে গেলেন অনাদিবাবু, বললেন, 'শুনে যাও নির্মল, তুমি এর বিচার করে দিয়ে যাও।'

বিব্রত হয়ে বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দিন মেসোমশাই আমি কলে বেরোচ্ছি। রোগী দেখতে যাচ্ছি।'

অনাদিবাবু বললেন, একেবারে কুরুক্ষেত্র বেধেছে। সরোজ তার ঘরের মধ্যে বসে শেভ করছিল। সেই অবস্থায় সাবানমাখা গাল নিয়ে সে উঠে এসেছে। সরোজের মা দোরের সামনে দাঁড়ানো। দু'জনে ঝগড়া হচ্ছে।

সরোজ বলল, 'আমার বউকে তোমরা অপমান করবে, যা নয় তাই বলে গালাগাল দেবে, আর আমি মুখ বুজে সব সহ্য করব, না?'

সরোজের মা বললেন, 'না, গালাগাল দেবে না পূজো করবে। যে বউ বাইরের লোকের হাত ধ'রে পার্কে বেড়ায় তার সঙ্গে হাসে গল্প করে, তেমন বাজারে বউকে নিয়ে তুই ভুলে থাকতে পারিস, আমরা পারব না।'

সরোজ রুখে উঠে বলল, 'খবরদার।'

সরোজের মা বললেন, 'অত কুঁদুনি কিসের। মারবি নাকি? তুই তাও পারিস।'

অনাদিবাবু এগিয়ে এলেন, 'ইস পারলেই হলো। তুলুক দেখি তোমার গায়ে হাত, একবার তুলে দেখুক। ওই হারামজাদার বেটা হারামজাদাকে আমি বলি দিয়ে ছাড়ব না? একেবারে হাড়িকাঠে ফেলে শেষ বলি দেব।'

সরোজ ক্ষুর হাতে দোরের সামনে আরো এগিয়ে এসে বলল, 'দিন, বলি দিন, দেখি কতখানি বুকের পাটা আপনার, গায়ের কতখানি জোর, দায়ে কতখানি ধার।'

মুহূর্তকাল পিতাপুত্র মুখোমুখি দাঁড়ালেন। রাগে ছু'জনের মুখ বিকৃত। ছু'জনের হিংস্র চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে। সেই ছু'জোড়া চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো স্নেহ ভালোবাসা, রক্তের সম্বন্ধ সব মিথ্যে। মানুষের সঙ্গে মানুষের শুধু একটি সম্বন্ধই আছে—সে সম্বন্ধ রক্তারক্তির।

আমি জোর করে অনাদিবাবুকে সরিয়ে নিয়ে এলাম। তিনি সেই আটকা অবস্থায় গর্জাতে লাগলেন, 'বেরিয়ে যাক, ও শুয়োর এক্ষুনি এই মুহূর্তে ওর বউ নিয়ে বেরিয়ে যাক।'

মাসীমা স্বামীর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যা। এই মুহূর্তে—।'

বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন তিনি।

সরোজ বলল, 'খবরদার, তুমি এঘরে এসো না, এ আমার ঘর। এ ঘরের ভাড়া আমি গুণি। এখানে তোমার কোন অধিকার নেই। এখানে ঢুকো না তুমি।'

'আমার বালাই পড়েছে তোর ঘরে ঢুকতে, তোর ঘরে আমি থুথু দেই, তোর ঘরে আমি থুথু দেই।' বলতে বলতে সরোজের ঘরের মধ্যে ঢুকে সত্যি সত্যিই কয়েক বার থুথু ফেললেন। তারপর বসে পড়ে কাশতে লাগলেন। কাশির সঙ্গে অনেকখানি রক্ত বেরিয়ে এলো। সে রক্ত চিনতে কোন ডাক্তারের ভুল হয় না।

দুর্বলতায় সরোজের মা সেইখানেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন।
সবাই স্তব্ধ নির্বাক।
একটু বাদে অনাদিবাবু খুব শান্তভাবে বললেন, 'মাতৃহন্তা পরশুরাম। মাকে হত্যা করবার জন্যে ও জন্মেছে।'
খানিকক্ষণ শুশ্রূষার পরে মাসীমার জ্ঞান ফিরে এল। তিনি বললেন, 'আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে চল।'
সরোজ বলল, 'আর বাড়াবাড়ি করো না। চুপ করে শুয়ে থাক।'
তারপর মাকে পাঁজাকোলে করে মেঝে থেকে তুলে নিজের পরিষ্কার বিছানায় শুইয়ে দিল সরোজ।
তখনকার মত ডাক্তারের যেটুকু করবার করে আমি বেরিয়ে এলাম। তারপর টি-বি'র সব সিম্পটমই দেখা গেল। জ্বর, কাশি। অ্যাটাকটা অনেকদিন আগেই হয়েছিল। মাসীমা বুঝতে পারেননি কি বুঝেও লুকিয়ে রেখেছিলেন।
আমি সস্তায় এক্সরে নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। দু'টো সাইডই ধরেছে। ডান দিকের জখমই বেশি। প্লেটে কালো কালো স্পটগুলি জ্বল জ্বল করতে লাগল।
সরোজের আর অন্য কোথাও সরে যাওয়া হলো না। স্ট্রেপটোমাইসিন রোজ আমিই গিয়ে দিয়ে আসি। সেদিন দেখলাম রোগশয্যার কাছে বাপ বেটা দুজনে পাশাপাশি বসেছেন। নিজের ঘর থেকে মাকে সরিয়ে নিতে দেয়নি সরোজ। নিজেই সরে এসেছে। সেই ঘরের বারান্দায় নিজের একক বিছানা পেতেছে। পাশের ঘরে ছোট দেওর-ননদদের নিয়ে রেণু থাকে। বাপ-ছেলেয় দু'জনে মিলে গোপন পরামর্শ চলে তাদের স্বল্প সম্বলে কি করে এই শক্ত রোগের সব চেয়ে ভালো চিকিৎসা করা যায়।
প্রকাশ্যে সরোজ মায়ের কপালে হাত বুলাতে বুলাতে তাঁকে আশ্বাস দেয়, 'কিচ্ছু ভেব না তুমি।' সরোজের মা চোখ বুজে থেকেই বলেন, 'আমার আবার ভাবনা কিসের। তোদের জন্যেই আমার ভয়।'

একটু দূরে রান্নাঘর। তার ছোট্ট জানালা দিয়ে চোখে পড়ে রেণুর পিঠে ভিজে চুলের রাশ ছড়ানো। সারি সারি ঠাঁই করে দেওর-ননদদের খেতে দিয়েছে। আর একবার যাচ্ছে উনুনের কড়ার কাছে। পথ্য তৈরী হচ্ছে শাশুড়ীর।

একদিন দেখি সরোজ নিজেই মাংস রাঁধতে বসে গেছে। আমাদের পিকনিক-টিকনিকে রান্নার ভারটা সরোজ নিজেই নেয়। উঁকি দিয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার।'

সরোজ বলল, 'মাকে আজ মাংসের জুস দেব। রান্নাটা মার কাছ থেকেই শিখেছিলাম।'

বলতে বলতে দু'ফোঁটা চোখের জল সেই মাংসের হাঁড়ির মধ্যে ঝরে পড়ল সরোজের।

বললাম, 'ছি ছি ছি ও কি হচ্ছে। এইভাবে তুমি রোগীর পথ্য করবে!'

'উনি ওই রকমই করেন।'

বলে স্বামীকে সরিয়ে দিয়ে রেণু গিয়ে রান্নার কাছে বসল।

স্পুটাম এখনো পজিটিভ। রেডিয়োলজিস্ট এখনো প্লেটে ক্যাভিটি দেখতে পাচ্ছেন। একস্‌রের প্লেটে ক্যাভিটি ছাড়াও আমি কিন্তু আরো অন্য কিছু দেখলাম কল্যাণবাবু। রোগের বীজাণুর মধ্যে অন্য রকমের বীজ আমাদের মত সাধারণ ডাক্তারের চোখে ধরা পড়বার কথা নয়। ভুল দেখলাম কি ঠিক দেখলাম আপনিই যাচাই করুন।

গাঙ্গুলীপাড়া থেকে নির্মলবাবুর আর একটি কল এল। তিনি বেরোবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। আমি তার আগেই উঠে পড়লাম।

শীতে বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শনের পর সুধাময়ী বললেন, 'আর ভালো লাগছে না জগু! চল কলকাতায় ফিরে যাই।' জগদীশ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সে কি মা, এখনো তো তোমার ত্রিতীর্থ হল না। এরই মধ্যে ফেরার কথা ভাবছ! কেন এবার সবতীর্থ সেরে যাও না।' সুধাময়ী ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না বাবা। তীর্থ করবার সাধ আমার মিটেছে। তীর্থে গিয়ে কি দেখব? মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর দেবতা দেখতে যাই, আমার সেই শত্তুরদের মুখ ঠাকুরের মুখকে ঢেকে দেয়। দেবদেবীর মুখ কোথাও তো দেখতে পেলাম না। মিছামিছি তোর একরাশ টাকা নষ্ট হ'ল। আরো নষ্ট ক'রে লাভ কি।'

জগদীশ বিষণ্ণভাবে হাসলেন, 'টাকা রেখেই বা আর লাভ হবে কি মা। টাকা কার জন্যে রাখব! সেকথা যাক। তুমি এখন কি করতে চাও বল। কলকাতায় ফিরে যেতে চাও?' সুধাময়ী বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমাকে সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে চল।'

জগদীশ মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি যাব না। কাশী থেকে কতলোক রোজ কলকাতায় যাতায়াত করছে। তোমাকে সঙ্গী ধরিয়ে দিচ্ছি, টাকা দিচ্ছি, তুমি তাদের কারো সঙ্গে কলকাতায় চলে যাও, আমি আরো ঘুরব।'

সুধাময়ী সেন ছেলের কথাগুলি প্রথমে ভালো ক'রে বুঝতে পারলেন না, অপলকে তাকিয়ে রইলেন, জগদীশের মুখের দিকে। তারপর ছেলের দুহাত জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'ওরে, তুই কি এমনই নিষ্ঠুর। তুই আমাকে সেই শূন্য পুরীতে একা পাঠিয়ে দিতে চাস? ওরে, তুই সঙ্গে না থাকলে আমি কি ক'রে সেখানে থাকব? এ সংসারে তুই ছাড়া আমার আর কে আছে?'

বাঙ্গালীটোলার ঘিঞ্জি পল্লী। গায়ে গায়ে ঘর। সুধাময়ীর কান্না শুনে ছেলে বুড়ো, নানাবয়সী স্ত্রীপুরুষ এসে জগদীশকে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ বা কৌতুকে কেউ বা কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? উনি অমন ক'রে কাঁদছেন কেন?'

জগদীশ আরো বিরক্ত আরো উত্যক্ত হয়ে উঠলেন, একটু রূঢ় ভাষায় জবাব দিলেন, 'কিছু হয়নি, উনি অমনিই কাঁদছেন। আপনারা আসুন এবার।'

তারপর জোর ক'রে মাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন জগদীশ, চাপা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'মা, তুমি যদি কথায় কথায় অমন করে কাঁদ, সত্যি বলছি, আমি কোথাও পালিয়ে যাব।'

সুধাময়ী আরও শিউরে উঠলেন ভয় পেয়ে আরও শক্ত করে চেপে ধরলেন ছেলের হাত, 'ওরে জগু, কি বললি, তুইও পালাবি। আমার ভাগ্যে বোধহয় এখন তাই-ই আছে। ওরে শেষে তুইও আমাকে ছেড়ে চলে যাবি।' তারপর আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি।

এর ফলে নরম গলায় মিষ্ট ভাষায় মাকে ফের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন জগদীশ। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারলেন সেই ভাষার মধ্যে প্রাণ নেই, আন্তরিকতা নেই। মাতৃবৎসল ছেলের ভূমিকায় নিজেকে বড়ই বেমানান মনে হ'তে লাগল জগদীশের। করুণরসের এমনই তৃতীয় শ্রেণীর অভিনয় যে, নিজের কাছেই তা হাস্যকর মনে হল।

তবু জগদীশ বললেন, 'না মা, কোথায় যাব আমি। তোমাকে ছেড়ে আমি কি কোথাও যেতে পারি। আমি কালই তোমাকে সঙ্গে ক'রে কলকাতায় নিয়ে যাব। দিনরাত কাছে থাকব তোমার।'

সুধাময়ী এবার একটু শান্ত হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন, তাঁর চোখের কোলে তখনো দু'ফোঁটা জল টলটল করছে।

মায়ের বয়স চুয়াত্তর, ছেলের বয়স উনষাট। কিন্তু দু'জনকে এখন প্রায় একবয়সীই দেখায়। বয়সের তুলনায় সুধাময়ী বরং একটু বেশি শক্ত আছে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা? সবই অবশ্য পেকে

সাদা হয়ে গেছে। চোখে এখনো চশমা নিতে হয়নি, শুধু মাড়ির দিকের তিনচারটে দাঁতই পড়ে গেছে কিন্তু সামনের দাঁতগুলি সবই অনড় আছে এখনো। বেঁটে ছোটখাট শরীর। তাই এত বার্ধক্যেও সামনের দিকে নু'য়ে পড়েনি। এখনো বেশ খাড়া সোজা হয়ে চলেন সুধাময়ী। গায়ের চামড়া অবশ্য কুঁচকে গেছে, তবু যৌবনের রঙের ঔজ্জ্বল্য এখনো টের পাওয়া যায়।

আর উনষাটের তুলনায় জগদীশকে বেশি বয়স্ক মনে হয়। তাঁর শুধু মাথার চুলই পেকে সাদা হয়ে যায়নি, জরার আঘাতে দাঁতগুলিও জখম হয়েছে। সামনের দু'তিনটি দাঁত নেই। বাকি যেগুলি আছে, সেগুলিও নড়বড় করে, মাঝে মাঝে ভারি যন্ত্রণা দেয়। চলা ফেরায় বেশ শক্ত থাকলেও হাঁটবার সময় পৌনে ছ'ফুট দীর্ঘ দেহ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে জগদীশের।

তাই মা আর ছেলেকে আজকাল সমবয়সীই দেখায়। সমবয়সী কেন বরং সুধাময়ীর চেয়ে জগদীশের বয়সই দু'চার বছর বেশি বলে মনে হয়। যাঁরা ওঁদের প্রকৃত সম্বন্ধ জানে না তারা হঠাৎ দেখলে ভাবে ভাই বোন। কেউ বা অন্যরকমও মনে করে। কিন্তু যে, যে রকম সম্বন্ধের কথাই ভাবুক এখন এঁরা পরস্পরের একমাত্র বন্ধন! দু'বছর আগে আসানসোল মোটর দুর্ঘটনায় আর সব শেষ হয়ে গেছে।

সে মোটরে ছিল জগদীশের স্ত্রী শৈলরাণী, ছেলে সুব্রত, মেয়ে সুলেখা, আর ছিল জগদীশের ছোট ভাই পৃথ্বীশ, তার স্ত্রী অনিমা, দুই ছেলে শুভেন্দু আর বিমলেন্দু। ড্রাইভ করে পৃথ্বীশই আসছিল কলকাতার দিকে। কিন্তু এসে আর পৌছানো হয়নি।

পৃথ্বীশ জগদীশেরই ছোট ভাই। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছেন। একই স্কুলে কলেজে পড়েছেন, শ্যামবাজারের পৈতৃক বাড়িতে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়ে নিয়ে একান্নভুক্তভাবে কাটিয়েছেন। তবু ক্ষতির কথা মনে হলে নিজের স্ত্রীপুত্র কন্যার কথাই আগে মনে পড়ে জগদীশের। আর সুধাময়ী কাঁদবার সময় পৃথ্বীশ আর তার দুই ছেলের নাম ধরেই বেশি কাঁদেন। শুভেন্দু আর বিমলেন্দুর বয়স

অল্প ছিল, তারা ঠাকুরমার কাছে থাকত হয়ত সেইজন্যেই। তবু জগদীশ এটা লক্ষ্য না করে পারেন না যে এই প্রচণ্ড মৃত্যুশোকও যেন মা আর ছেলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। যেন দু'জনে দুই আত্মীয়গোষ্ঠীকে হারিয়েছেন তাঁরা।

সুধাময়ীর পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত জগদীশকে পরদিন কলকাতার দিকেই রওনা হ'তে হ'ল। শ্যামপুকুরের সেই পুরোন দোতলা বাড়িতেই ফিরে এলেন তিনি। ফিরে আসবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। অন্তত বছরখানেক সারা ভারত ঘুরে বেড়াবেন সেই সঙ্কল্প আর সঞ্চয় নিয়েই তিনি বেরিয়েছিলেন। তাঁর তীর্থে বিশ্বাস নেই, দেবদেবীতেও নয়। তিনি বেরিয়েছিলেন শুধু পথের জন্যে, বেরিয়েছিলেন, ঘরে আর থাকতে পারছিলেন না বলে। 'হে ভবেশ! হে শঙ্কর! সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ।'

কিন্তু সুধাময়ী সেই পথটুকুও কেড়ে নিলেন। তাঁর ঘর না হলে চলে না। কিন্তু সে ঘর তো শূন্য ঃ সে ঘর তো শ্মশান। সেই শ্মশানে বসে দু'বছর তো দিনরাত বুক চাপড়ে মা আর ছেলে কেঁদেছেন, অনবরত চোখের জল ফেলেছেন, আর কেন।

এমন যে হবে, মা যে তীর্থে গিয়েও শান্তি পাবেন না, দু'দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন, অতিষ্ঠ করে তুলবেন তা অবশ্য গোড়াতেই আন্দাজ করেছিলেন জগদীশ। তাই মাকে তিনি সঙ্গে নিতে চাননি। কিন্তু সুধাময়ী ছেলের সঙ্গ ছাড়লেন না। তাঁর কেবল এক কথা, 'আমি একা থাকতে পারব না।'

জগদীশ বলেছিলেন, 'একা থাকবে কেন। রেণুর কাছে গিয়ে থাক না।'

রেণু তাঁর দূর সম্পর্কের পিসতুতো বোন। ভবানীপুরের হালদারদের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে।

সুধাময়ী মাথা নাড়ায়, জগদীশ আরো দু'একজন আত্মীয় কুটুম্বের নাম করলেন।

তখন সুধাময়ী বলতে শুরু করলেন, 'আমি তোকে একা ছেড়ে দিতে পারব না।'

তাই মাকে বাধ্য হয়ে সঙ্গে নিতে হয়েছিল জগদীশের। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর এ ভুল করবেন না। এবার যখন বেরোবেন, না বলে না জানিয়েই বেরোবেন। এমন প্রচণ্ড শোকই যখন সুধাময়ী এই বৃদ্ধবয়সে সহ্য করতে পেরেছেন, জগদীশের মাসকয়েকের বিচ্ছেদও তাঁর সইবে।

গলির ভিতরের দিকে সেই দোতলা লালচে রঙের বাড়িটা। ঠিক তেমনই দাঁড়িয়ে আছে। এখন আর এবাড়িকে কেউ পুরোন পুরোন বলতে পারে না। তিন বছর আগে এবাড়িকে ভেঙে প্রায় নতুন ক'রে গড়েছিলেন দু'ভাই। আগে ঘরের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু ছেলেরা বিয়ে-থা করলে আরো বেশি ঘরের দরকার হবে সে কথা ভেবে দু'ভাই আরো তিনখানা ঘর বাড়িয়েছিলেন। দু'এক বছর বাদে তিনতলার কাজ শুরু করবারও পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু জল্পনা-কল্পনা আসানসোলের রাস্তার ধারের খানার মধ্যে চুরমার হয়ে গেছে।

বাড়ির আর সব ঘর তালাবন্ধ ছিল, তালাবন্ধই রইল। শুধু দোতলায় নিজের পড়বার ঘরখানি খুলে নিলেন জগদীশ। আর একতলায় কোণের দিকে খোলা রইল দ্বিতীয় ঘরখানা। সেখানে সুধাময়ী থাকেন।

আজ নয়, সেই দুর্ঘটনার দিনকয়েক বাদেই এই ব্যবস্থা করেছেন জগদীশ।

সুধাময়ী অনেক আপত্তি করেছিলেন, 'কেন, তুই তোর বড় ঘরে থাক না। ওখানে তো খাট বিছানা টেবিল আলমারী সবই আছে।'

তা আছে। প্রথমে স্ত্রীর সঙ্গে একই খাটে ঘুমোতেন জগদীশ। কিন্তু ছেলে মেয়ে বড় হওয়ার পর ছোট ছোট দু'খানা আলাদা খাট ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু গভীর রাত্রে শৈলরাণী যখন চুপি চুপি জগদীশের খাটে উঠে আসতেন তখন স্ত্রীকে আর প্রৌঢ়া বলে মনে হ'ত না। মনে হ'ত আলতাপরা নবোঢ়া কিশোরীই যেন ফুলশয্যার দিকে এগিয়ে আসছে। বড় শোবার ঘরখানায় আজও সেই জোড়া খাট আছে, ড্রেসিং টেবিল, আর দামী শাড়ী ব্লাউজভরা কাঁচের আলমারী

রয়েছে তার হাতের ছোঁয়ালাগা সবগুলি আসবাব, কিন্তু যার জন্যে এই ঘর সাজিয়েছিলেন জগদীশ সে তো আর নেই। ও ঘরে একা একা তিনি কি ক'রে থাকবেন।

ছেলের মনের কথা অনুমান করে সুধাময়ী বলেছিলেন, 'তোর যদি ও ঘরে একা থাকতে ভয় করে বল, আমি এসে থাকি।'

জগদীশ মাথা নেড়েছিলেন, 'না মা তোমার ও ঘরে থাকতে হবে না, তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাক।'

সুধাময়ী ছেলের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'কিন্তু একা একা নিচের ঘরে থাকতে আমারও তো ভয় করতে পারে।'

জগদীশ মার দিকে চেয়ে অদ্ভুত একটু হেসেছিলেন, 'তোমারও ভয়! তাহলে রেণুর ছোট ছেলেকে এনে তোমার কাছে রাখ।'

সুধাময়ী গভীর অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, 'না, আমার আর কারো ছেলেকেই কাছে এনে দরকার নেই।'

মার সঙ্গে একঘরে থাকবার প্রস্তাবই যে জগদীশ নাকচ করেছিলেন তাই নয়, সুধাময়ী পাশের ঘরে এসে থাকবেন এ ব্যবস্থাও তাঁর মনঃপূত হয়নি।

সুধাময়ী ছেলের এই বিদ্বেষ দেখে অবাক হয়ে ভেবেছিলেন জগু কি সত্যিই বিশ্বাস করে সুধাময়ী বেশি-বয়স অবধি বেঁচে রয়েছেন বলে আর সবাই অকালে চলে গেছে। তিনিই সবাইকে খেয়েছেন? ছেলের এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরে সুধাময়ী একদিন এসে সত্যিই কেঁদে পড়লেন, 'ওরে জগু, তাই যদি তোর ধারণা—আমার জন্যেই যদি তোর এই সর্বনাশ হয়ে থাকে, আমাকে মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল। কিছু আমাকে এনে দে, আমি তাই খেয়ে মরি।'

জগদীশ পরম নির্লিপ্ত শান্তভাবে জবাব দিয়েছিলেন, 'আশ্চর্য, তুমি কি ক্ষেপে গেলে মা তোমার জন্যে কেন হবে? তোমার সঙ্গে সে দুর্ঘটনার কি সম্পর্ক। যাও, ঘরে যাও।'

সুধাময়ী সেখান থেকে চলে গেলে জগদীশ গুনগুন করে গান ধরেছিলেন, 'শ্মশান করেছি হৃদি, সেখানে নাচুক শ্যামা।'

সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর কিছু দিন ধ'রে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকেই এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। দেখা করতে এসেছেন জগদীশের কলেজের সহকর্মী আর ছাত্রের দল। সবাই তাঁকে অনুরোধ করেছে তাঁদের বাড়িতে যেতে, মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে। কিন্তু জগদীশ কারো কথা কানে তোলেননি। ইচ্ছা করে যে তোলেননি তা নয়। কেন যেন আগ্রহ বোধ করেননি, সাধ্য হয়নি মানুষের সঙ্গে আর সংযোগ রাখবার। কি ক'রে হবে। মৃত্যুর স্পর্শে তাঁর হৃদয় একেবারে পাথর হয়ে গেছে। সেখানে মানুষের সুখ দুঃখ হাসিকান্নার কোন স্পর্শ অনুভূত হয় না।

সরকারী কলেজের অধ্যাপকের কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন জগদীশ রায়। না নিয়ে পারেননি। পড়াতে আর ভালো লাগে না। তরুণ ছাত্রদের সঙ্গ দুঃসহ মনে হয়। শুধু ছাত্র নয় মানুষমাত্রকেই মনে হয় হাত পা চোখ কান বিশিষ্ট একটা যন্ত্র। তার ভালোমন্দ সুখ দুঃখে জগদীশের কিছু এসে যায় না। যন্ত্রণাবোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আসলে তিনি নিজেই যন্ত্র হয়ে গেছেন। যে দুর্ঘটনায় তাঁর সব গেছে তার কোন ব্যাখ্যা নেই, প্রতিকারের সম্ভাবনা নেই, কারো ওপরই কোন প্রতিশোধ নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, তাঁর নিজের ভাইয়ের অনিচ্ছাকৃত অনতর্কতার জন্যে তাঁর সমস্ত প্রিয়জন প্রাণ হারিয়েছে। এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। কিন্তু ওই শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কি সব শোকের সান্ত্বনা মেলে? কার্যকারণের সব তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়? হয় না বলে নিজের মধ্যেই যেন অসঙ্গতির অনুশীলন করছেন জগদীশ। তাঁর আচরণ চালচলনের মধ্যে কোন যুক্তি নেই। সুধাময়ী বলেছিলেন, 'এতগুলি ঘর দিয়ে কি হবে। বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দে, তবু মানুষজন এসে থাকুক।'

জগদীশ বলেছিলেন, 'কেন ভাড়া দেব? টাকার জন্যে? আমার আর টাকার কি দরকার? যা আছে তাতেই বাকি ক'টা দিন চলে যাবে।'

পাড়ার তরুণ সঙ্ঘের ছেলেরা এসে ধরেছিল, 'জ্যেঠামশাই, ঘরগুলি আমাদের সমিতিকে দিন। আমরা একটা নাইট স্কুল আর লাইব্রেরী

চালাব। আপনিই প্রেসিডেণ্ট থাকবেন।' জগদীশ জবাব দিয়েছিলেন, 'আর দুটো দিন সবুর করো। অমি মরবার আগে উইল করে তোমাদের সব দিয়ে যাব। সে একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা হবে। ততদিন তোমাদের সমিতি যেখানে আছে সেখানেই থাকুক।' ছেলেরা আড়ালে গিয়ে গাল দিয়েছিল, 'বুড়োর ভীমরতি ধরেছে ?'

বাড়িতে অনেকদিনের পুরোন চাকর ছিল গোবিন্দ। সেও একদিন বিদায় নিল। অকারণে বড় গালমন্দ করতেন, মারতে আসতেন, শুধু সেইজন্তেই নয়। গভীররাত্রে তার ঘরের সমুখ দিয়ে ভূতের পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল। শুধু তার ঘরের কাছেই নয়, সারা বাড়ি ভরেই সেই ভূতের আনাগোনা।

গোবিন্দ সুধাময়ীর কাছে কাঁদো কাঁদো ভাবে বিদায় নিয়ে বলল, 'আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না বুড়ো মা। কিন্তু থাকতে আর সাহস হয় না।'

সুধাময়ী নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তোকে আমি আর থাকতে বলিওনে গোবিন্দ, তুই যা। এই শ্মশানে তোর আর থেকে কাজ নেই।'

তিন মাসের মাইনে বেশি দিয়ে গোবিন্দকে বিদায় ক'রলেন তিনি। তারপর ছেলের কাছে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে জগু তোর এ কি কাণ্ড, শেষপর্যন্ত ভূত সেজে গোবিন্দকে তাড়ালি তুই।'

জগদীশ বললেন, 'ভূত আমাকে সাজতে হয়নি মা। তাদের সাতজনের ভূত আমার বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। আমি নিজে কিছু করিনে। তারাই আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।'

জগদীশের ভাবভঙ্গি দেখে বাড়ির রাঁধুনী বালবিধবা সুশীলাও চোখের জল ফেলে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সুধাময়ী বললেন, 'সবাইকে তাড়ালি এবার আমাকেও তাড়িয়ে দে। আমি যে আর টিকতে পারছিনে জগু।'

কিন্তু লোকজন সব বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর জগদীশ যেন খানিকটা শান্ত হলেন। খানিকটা স্বাভাবিকতা এল তাঁর মধ্যে। লাইব্রেরী ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে বই হাতে আগের মতই

এসে বসেন। মাঝে মাঝে পুরোন দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেও বেরোন।

আর কাউকে রাখবার চেষ্টা করলেন না সুধাময়ী। নিজেই হেঁশেলের ভার নিলেন। ভারি তো হেঁশেল। একবেলা দু'জনের জন্যে রাঁধতে হয়। অনেকদিন থেকেই রাত্রে ভাত খান না জগদীশ। দুধ খই, মিষ্টি, ফলমূল হলেই চলে।

কলকাতার বাইরে থেকে কিছুদিন ঘুরে আসবার পরেও জগদীশের অভ্যস্ত দিনযাত্রা বদলাল না। লাইব্রেরী ঘরেই ক্যাম্পখাট বিছিয়ে রাত্রে নিজের শোবার ব্যবস্থা করলেন। দিনের বেশির ভাগ সময় কাটে বারান্দার ইজিচেয়ারে। চুপচাপ বসে থাকেন, কখনো বা করিডোর দিয়ে পায়চারি করেন। মাঝে মাঝে রেলিংএ ভর করে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধা মার ঘরকন্নার কাজ দেখেন। ঠিকে ঝি অবশ্য একটি আছে। দু'বেলার সব কাজ করে দিয়ে সন্ধ্যার পর নিজের বাসায় চলে যায় মেনকা।

জগদীশ ওপর থেকে লক্ষ্য করেন কখনো কখনো সেই আধবয়সী ঝি মেনকার কাছে বসে কাঁদেন সুধাময়ী। সহানুভূতি জানাবার জন্যে কখনো বা পাড়ার দু'একটি বউও তাঁর কাছে আসে।

তিনি পুরোন দিনের কথা, ছেলে বউ নাতি নাতনীদের কথা বসে বসে বলতে থাকেন। আর আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছেন। দেখে দেখে কেমন যেন একটা বিদ্বেষ বোধ করেন জগদীশ। কই তিনি তো এমন ক'রে পাড়ার পাঁচজনের কাছে শোক প্রকাশ করেন না, চোখের জল ফেলতে পারেন না, চোখের জল মুছতে পারেন না, শুধু বুকের মধ্যে একটা ভারি পাথরের দুঃসহ চাপ অনুভব করেন। মাঝেসাঝে সেই পাথর অগ্নিগোলক হয়ে জ্বলতে থাকে।

তবু নিজের জ্বালা নিয়ে নিজেই বেশ থাকতে পারতেন জগদীশ। কিন্তু সুধাময়ী আবার তাঁকে নতুন করে জ্বালাতে লাগলেন। জগদীশের অপরাধ ঠাণ্ডা লেগে তাঁর একটু সর্দিজ্বর হয়েছিল। দাঁতের যন্ত্রণাটাও বেড়েছিল সেই সঙ্গে। আর রক্ষা নেই। পাড়ার লোক-

জন আর ডাক্তার ডেকে হৈ চৈ করে সুধাময়ী সারা বাড়ি মাথায় করে তুললেন।

জ্বর অবশ্য দু'তিন দিনের মধ্যেই ছেড়ে গেল, কিন্তু সুধাময়ী ছেলেকে সহজে ছাড়লেন না। তিনি জগদীশকে বলতে লাগলেন, 'শরীরের ওপর অনিয়ম ক'রেই তুমি এই কাণ্ড ঘটিয়েছ। আর আমি তোমাকে অমন নিজের খেয়ালে চলতে দেব না। তুমি সময় মত চান করবে, খাবে, ঘুমুবে। দেখি তোমার শরীর কি ক'রে খারাপ হয়।'

শুধু কথায় শাসন ক'রেই সুধাময়ী ক্ষান্ত হলেন না। কাজেও জগদীশের সর্বদা খবরদারি করতে শুরু করলেন।

জগদীশ হয়ত দর্শনের ভাববাদ আর বস্তুবাদের তুলনামূলক সমালোচনা পাঠে নিমগ্ন, সুধাময়ী ছোট একটু তেলের বাটি হাতে পা টিপে টিপে দোতলায় তাঁর ঘরের সামনে এসে হাজির হলেন, 'ও জগু, দেখ ঘড়িতে ক'টা বাজল। চান করবি কখন।'

জগদীশ বই থেকে মুখ তুলে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এইতো সবে দশটা। আমি বারটার আগে কোনদিন নাইতে যাই না। তুমি আবার কেন কষ্ট ক'রে এখানে এলে। ডাকলে আমিই তো নিচে যেতে পারতাম।'

সুধাময়ী একটু হাসলেন, 'হুঁ, তুমি আমার সেই ছেলেই কিনা। ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেললেও তো একটু টু শব্দ করিসনে তুই। আয় আমি তোকে তেল মাখিয়ে দিই। তুই অমন ছটফট করছিস কেন। তুই বসে বসে পড় না। আমি তোর পিঠে তেল দিয়ে দিই।'

জগদীশের পিঠে সুধাময়ী সত্যিই তেল লাগাতে শুরু করে দেন। প্রথমে কেমন একটু সুড়সুড়ি বোধ হয়, তারপর রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন জগদীশ। দু' এক মিনিট যেতে না যেতেই উত্যক্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'সরো সরো, তোমাকে আর তেল মালিশ করতে হবে না যাও এখান থেকে।'

সুধাময়ী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'কেন জগু, খারাপ লাগছে তোর।'

জগদীশ চেঁচিয়ে উঠে বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয়ানক খারাপ লাগছে। তুমি যাও এখান থেকে।'

সুধাময়ী একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'কিন্তু বউমা তো তোকে রোজ তেল মাখিয়ে দিত। সে যেদিন পারত না, তোর মেয়ে স্থলু এসে বসত তেলের বাটি নিয়ে। তখন তো তুই এমন করতিনে।'

স্ত্রীকন্যার উল্লেখে বুকে যেন নতুন ক'রে ঘা লাগল। তাদের অভাব আবার নতুন ক'রে অনুভব করলেন জগদীশ। অস্থির হয়ে বলে উঠলেন, 'তাদের কথা তুল না মা, তাদের নাম আর মুখে এন না। আশ্চর্য, তারা মরে গিয়েও তোমার হিংসের হাত থেকে রক্ষা পেল না?'

সুধাময়ী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি, কি বললি। তাদের আমি হিংসে করি, তাদের আমি হিংসে করতাম! ওরে, আমার পরম শত্তুরও যে একথা বলতে পারত না। আর তুই আমার পেটের ছেলে হয়ে এই কথা বললি! ভগবান তুমিই সাক্ষী। এখনো দিনরাত হয়। এখনো আকাশে চাঁদ সূর্য উঠে। ভগবান—'

জগদীশের আর সহ্য হ'ল না। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তর্জনী বাড়িয়ে বললেন, 'যাও, চলে যাও, নিচে যাও বলছি।'

সুধাময়ী কেঁদে কেঁদে বললেন, 'তাতো যাবই। আজ আমার বাতাস তোর সহ্য হয় না। আজ আমি হাত দিলে তোর গায়ে বিছুটি লাগে। কিন্তু চিরকালই এমন ছিল না, চিরকালই মাগ আর মেয়ের হাতে তুই মানুষ হসনি। এমন দিনও ছিল যখন আমি না নাইয়ে দিলে তোর নাওয়া হ'ত না, আমি না খাইয়ে দিলে তোর পেট ভরত না, আমার বুকের সঙ্গে মিশে থাকতে না পারলে ঘুম আসত না তোর—'

জগদীশ আবেগহীন নিস্পৃহ স্বরে বললেন, 'আমার অপরাধ হয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর, তুমি তোমার ঘরে যাও মা।'

সুধাময়ী আর দ্বিরুক্তি না ক'রে নিচে নেমে গেলেন। সেখান থেকে তাঁর কান্না শোনা যেতে লাগল, 'ওরে আমার ছোটনরে, তুই

আমাকে ফেলে কোথায় গেলিরে বাবা। সবাইকে নিয়ে গেলি যদি, আমাকেও নিলিনে কেন।'

পৃথ্বীশের ডাক নাম ছিল ছোটন।

জগদীশ বই বন্ধ ক'রে ভাবতে লাগলেন একথা সত্যি মায়ের কোলেই প্রথম জন্ম নিয়েছিলেন তিনি। একান্ত ভাবে মায়ের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন। বাবা থাকতেন দূরে দূরে বাইরে বাইরে। জগদীশ আর তার মার মধ্যে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। কিন্তু সংসারের নিয়মে সেদিনের বদল হল। বাবা চলে গেলেন কিন্তু একে একে অনেকে এল। কত বিচিত্র সম্পর্ক, আর তার বিচিত্র স্বাদে জীবন ভরে উঠল। স্বভাবের নিয়মে মা রইলেন এক পাশে সরে, এক পাশে পড়ে। জগদীশের মনোলোক থেকে চিরনির্বাসন ঘটল তাঁর। আজ আবার সব মুছে গেছে, আজ আবার তাঁদের মাঝখান থেকে ব্যবধান নিশ্চিহ্ন হয়েছে। দূরের অবজ্ঞাত কোণ থেকে আজ ফের মা আবার জগদীশের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'চেয়ে দেখ, আমি আছি। আয় আবার আমি তোর সব হই, তুই আমার সব হয়ে ওঠ।'

কিন্তু তাই কি হয়? একমাত্র অতি শৈশব ছাড়া মা কি মানুষের সব হ'তে পারে! ভাই, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা একাধারে সকলের স্থান নেওয়া কি সম্ভব? জগদীশের মনে হয় মা সব হ'তে তো পারেনই না, এমন কি পুরোপুরি ছেলেবেলার সেই মা থাকাও আর তাঁর পক্ষে সাধ্য নয়। যেতে যেতে, ভাঙতে ভাঙতে একটুখানি মাত্র থাকে। সেইটুকু হয়েই কেন খুশী থাকেন না সুধাময়ী। কেন আরো বেশি হ'তে চান, আরো বেশি দিতে চান, আরো বেশি পেতে চান? জগদীশ ভাবেন, মা আর তাঁর মাঝখানে যারা এসেছিল তারা তো সত্যিই ব্যবধান হয়ে ছিল না, তারা ছিল সেতু। তারা ছিল জগদীশের বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র। মায়ের সঙ্গেও সংযোগের মাধ্যম, মধ্যমণি। সেই সুতো ছিঁড়ে গেছে। কারো সঙ্গেই জগদীশের কোন বন্ধন নেই।

আরো কিছুদিন কাটল। জগদীশ ফের পালাই পালাই করতে লাগলেন। মায়ের এই অতি বাৎসল্যের হাত থেকে মুক্তি নেবেন,

অতিরিক্ত দান আর অতিরিক্ত দাবির বন্ধন থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্যেও মুক্ত থাকবেন।

দূর সম্পর্কের সেই বোন আর ভাগ্নের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ ক'রে বৈষয়িক ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেললেন জগদীশ। মাকে না জানিয়েই তিনি এবার বেরিয়ে পড়বেন। এবার আর শুধু ভারত নয়, ভূভারত। সুধাময়ীকে দেখাশোনা করবার জন্যে রেণুর নিঃসন্তান খুড়শ্বশুর আর খুড়ি শাশুড়ী এ বাড়িতে এসে নিচের একটা ঘর নিয়ে থাকবেন। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত শেষ। পোশাকপরিচ্ছদ বিছানা বালিশের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। যাত্রার আর দু'দিন মাত্র বাকি, এই সময় এক কাণ্ড ঘটল। ভোরে উঠে নিচে একটা শোরগোল শুনতে পেলেন জগদীশ।

মেনকা ঝি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, 'কর্তাবাবু, দেখুন এসে ব্যাপার।'

জগদীশ নিচে নেমে এসে দেখলেন, তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায় একটা রক্তমাখা পুঁটলি পড়ে রয়েছে। প্রথমে ভাবলেন কুকুরে কোন নর্দমার ধার থেকে মাংসের নেকড়া টেকড়া মুখে ক'রে এনে থাকবে। কিন্তু মেনকা একটা কাঠি দিয়ে পুঁটলিটা নাড়তেই সকলের ভুল ভাঙল। রুগ্ন, বিবর্ণ, মৃতপ্রায় সদ্যোজাত এক মানবশিশুকে কে যেন এই কবরখানায় ফেলে রেখে গেছে।

জগদীশ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কুকুর নয়, এ নিশ্চয়ই সেই তরুণ সঙ্ঘের কুকুরদের কীর্তি। আমি তাদের ঘর ছেড়ে দিইনি ব'লে তারা আমার ওপর এমন ক'রে শোধ নিয়েছে। কিন্তু আমার নামও জগদীশ রায়। পাজী বদমাস ছাত্র আমি কম চড়াইনি। তাদের কি ক'রে সোজা করতে হয় তা আমি জানি। আমি এক্ষুণি থানায় খবর দিচ্ছি। ওদের সবগুলির নামে ডায়েরি করব।'

সুধাময়ী এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলেন, এবার এগিয়ে এসে শান্তভাবে বললেন, 'জগু, অত চেঁচাসনে। ব্যাপারটা কি দেখতে দে আগে। ওরে মেনকা ভালো ক'রে দেখ দেখি এখনো বেঁচে আছে না মরে গেছে।'

মেনকা একটু নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, 'এখনো বেঁচে আছে বুড়ো মা।'
'আছে?' উল্লসিত হয়ে উঠলেন স্থধাময়ী, 'এই শ্মশানের বাতাস লেগেও এতক্ষণ প্রাণ রয়েছে? নিয়ে আয় মেনকা, ওকে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে আয়। ও আমার সেই কাশীর বাবা ভোলানাথ, বাবা বিশ্বনাথ। নিয়ে আয় ওকে।'
কিন্তু জগদীশ রুখে দাঁড়ালেন, 'মা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? এসব ছেলে কোত্থেকে হয়, কিভাবে হয় তা তুমি জান না?'
স্থধাময়ী বললেন, 'জানব না কেন। সবই জানি জগু। কিন্তু তা'তে তোরই বা কি, আমারই বা কি। আমরা দু'জনেই এখন সমাজ সংসারের বাইরে। আহা দেখ, কিরকম নীল হয়ে গেছে শীতে।'
জগদীশ বললেন, 'দেখেছি—দয়া করতে চাও। আমি টাকা দিচ্ছি, লোক দিচ্ছি একটা অনাথ আশ্রম টাশ্রমের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি—।'
স্থধাময়ী বাধা দিয়ে বললেন, 'ওরে ক্ষ্যাপা, এই বাড়িও তো এক মস্ত অনাথ আশ্রম। তুই এক অনাথ, আমি এক অনাথ। মেনকা আর দিক করিসনে বাছা, ওকে আমার ঘরে নিয়ে আয়।'
জগদীশ দু'পা এগিয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে ফের বাধা দিয়ে বললেন, 'না। আমি বলছি, না। এ বাড়ি আমার। আমার অমতে এ বাড়িতে কিচ্ছু করা চলবে না।'
স্থধাময়ীও ছেলের দিকে এগিয়ে এলেন, জলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন একটুকাল, তারপর মুখের বিকৃত ভঙ্গি ক'রে তারস্বরে চেঁচিয়ে বললেন, 'কি বললে জগু রায়, এ বাড়ি একা তোমার? এতে আমার কোন অংশ নেই? কিন্তু এ আমার সোয়ামীর হাতের গড়া বাড়ি, এ আমার সোয়ামীর হাতের পোতা ইট। আমি যতক্ষণ আছি আমার জীবনস্বত্ব আছে। যাও উকিলের কাছে যাও, জজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাও, ছোট আদালত বড় আদালত যা খুশি তাই কর গিয়ে। তারা যদি আমাকে বেদখল করে তখন বলতে এসো।'
জগদীশ একটুকাল গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'আমি আর কিচ্ছু বলতে চাইনে। তুমি থাক তোমার দখল নিয়ে, আমি চললুম।'

কিন্তু চললুম বললেই কি আর চলা যায়। বেশীদূর যেতে পারলেন না। যেতে যেতে নিজের ঘরে গিয়েই ঢুকলেন জগদীশ। জাত-জন্মের সংস্কার তিনিও মানেন না। এসব ব্যাপারে জগদীশ যথেষ্ট উদার। কিন্তু আর কিছু না মানেন, আর কাউকে না মানেন নিজেকে তো মানেন জগদীশ। সুধাময়ীর আচরণ তাঁর অহংবোধকে বার বার পীড়া দিতে লাগল। তাঁর মতের বিরুদ্ধে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুধাময়ী রাস্তার একটা অবৈধ অবাঞ্ছিত ছেলেকে কুড়িয়ে ঘরে তুলে নিলেন এতে রাগে আর বিদ্বেষে জগদীশের সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল। অন্য সময় হলে তিনি হয়ত বিস্মিত হতেন। এই ধর্মভীরু, আচারসর্বস্ব স্বল্পাক্ষরা ব্রাহ্মণ বিধবা কি ক'রে এমন কাজ করতে পারলেন, সর্বত্যাগিনী না হ'লে তাঁর পক্ষে এই গ্রহণ সম্ভব ছিল কিনা সে প্রশ্ন জগদীশের অন্তত একবারও মনে পড়ত। কিন্তু এই মুহূর্তে শুধু জ্বালা আর অপমানবোধ ছাড়া সব তাঁর অনুভূতির বাইরে পড়ে রইল।

জগদীশ ভবঘুরে হওয়ার সঙ্কল্প আপাতত ত্যাগ করলেন। এ গলি ও গলি ঘুরে শেষ এসে ঢুকলেন নিজের ঘরে। ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না করে তিনি এখান থেকে নড়বেন না।

কিন্তু কি হেস্তনেস্ত করবেন ভেবে স্থির করতে পারলেন না জগদীশ। নিজেদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে বাইরের কাউকে সালিস মানবার অভ্যাস তাঁর কোনদিনই ছিল না। বরং অন্যসব আত্মীয় বন্ধু কুটুম্বের বিরোধে তিনি মধ্যস্থতা করেছেন। আর আজ যদি মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এই ষাট বছর বয়সে তিনি যদি প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হন তাহ'লে লোকে কি বলবে। না, মস্তিষ্কের অতখানি বিকৃতি তাঁর আজও ঘটেনি। প্রতিকারের অন্য উপায়ের কথা ভাবতে লাগলেন জগদীশ।

এদিকে সুধাময়ী সেই কুড়োন ছেলেকে ঘরে তুলে নিয়েছেন, কোলে তুলে নিয়েছেন, মেনকার সাহায্যে শিশুর খাবারের জন্যে মধু আর মিছরির জলের ব্যবস্থা করেছেন। ঝিনুক-বাটি, কাঁথাবালিশ আগন্তুকের ভোজন-শয়নের সব উপকরণই একে একে সংগৃহীত হচ্ছে।

ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই টের পেতে লাগলেন জগদীশ, সবই দেখতে লাগলেন। সুধাময়ীর ঘর যেন এক তরুণী মায়ের আঁতুড়ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। আর সুধাময়ী শুধু নতুন জীবনই পাননি, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছেন। তাঁর চলাফেরা ছুটোছুটির বিরাম নেই। নানা বয়সী বউ ঝিরা তাঁর ঘরের সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। সুধাময়ী তাদের একজনকে বোঝাচ্ছেন, 'জানো বউ আমার ছোটনও ঠিক এইরকমই হয়েছিল। তিনদিনের মধ্যে মাই টানেনি। দেখে কেউ বলেনি যে বাঁচবে।'

শুনতে শুনতে এই বৃদ্ধ বয়সেও এক অদ্ভুত ঈর্ষা বোধ করেন জগদীশ। ছাপ্পান্ন বছর আগে ছোট ভাইকে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে দেখে ঈর্ষা হয়েছিল এ যেন সেই ঈর্ষা।

চটি পায়ে জগদীশ নিচে নেমে এসে মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার সেই নতুন আঁতুড়ঘর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'মা, ওকে তাহ'লে তুমি সত্যিই বাইরে কোথাও পাঠাতে দেবে না ?'

সুধাময়ী অবাক হয়ে বলেন, 'তুই কি বলছিস জগু, এ অবস্থায় বাইরে পাঠালে ও বাঁচবে ?'

জগদীশ বলেন, 'কেন বাঁচবে না ? আমি খুব ভালো হাসপাতাল ঠিক ক'রে দিচ্ছি। সেখানে বেশ যত্ন ক'রে রাখবে।'

সুধাময়ী বললেন, 'অবাক করলি তুই। তোরা কোন্ হাসপাতালের যত্নে বেঁচেছিল শুনি ? বউমাদেরও ছেলেপুলে যা হয়েছে সব আমার কাছে, না হয় তাদের বাপের বাড়িতে। কেউ কি অযত্নে ছিল ?'

জগদীশ এবার রুক্ষ স্বরে বললেন, 'তাহ'লে তুমি আমার কথা শুনবে না মা ?'

সুধাময়ী স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'না আমি তোমার কোন অন্যায় কথা শুনতে চাইনে বাপু।'

জগদীশ আর কিছু না ব'লে ওপরে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় শিশুর ক্ষীণ কান্না তাঁর কানে গেল। কিন্তু প্রাণে গিয়ে পৌঁছল না।

এই পরিত্যক্ত কুড়িয়ে পাওয়া শিশু একান্তভাবেই সুধাময়ীর জেদ আর খেয়ালের সামগ্রী। ওর সঙ্গে জগদীশের কোন সম্পর্ক নেই।

পঁচাত্তর বছরের নির্বোধ বৃদ্ধার এই জেদের কি প্রতিকার করা যায় তাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল জগদীশের। একবার ভাবলেন, মাকে জোর ক'রে এই বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবেন। আর একবার ভাবলেন, নিজেই চ'লে যাবেন এখান থেকে। তৃতীয়বার মতলব আঁটলেন, টাকা দিয়ে গুণ্ডা ঠিক করবেন। একদিন গভীর রাত্রে সে ওই ছেলেটাকে অন্য কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে। যে অসঙ্গত সুড়ঙ্গপথে ও এসেছিল সেই পথেই ও চলে যাবে।

কিন্তু কোন পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগল না জগদীশের। রাত্রের ভাবনা দিনের আলোয় অবাস্তব লাগতে লাগল। সুধাময়ী রাত্রে ছেলেটিকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমোন। আদর ক'রে ডাকেন 'বিশু আমার বিশু। আমার বারাণসীর বিশ্বনাথ।'

মাঝে মাঝে জগদীশকেও ডাকেন সুধাময়ী, 'ও জগু, দেখ এসে কেমন হাসছে। এত দুষ্টু হয়েছে এরই মধ্যে।'

জগদীশ মার ডাকে সাড়া দেন না। সুধাময়ীর সোহাগের বাড়াবাড়ি দেখে রাগে তাঁর গা জলে যায়। মানবশিশুর মুখে এই কি প্রথম হাসি দেখলেন সুধাময়ী? জীবনে আর কোনদিন দেখেননি? না কি সব স্মৃতি ইচ্ছা ক'রে ভুলে গিয়েছেন?

সুধাময়ীর জপতপ ধ্যানধারণা সব গেছে। দিনরাত্রির বেশির ভাগ সময়ই তাঁর এখন বিশুকে নিয়ে কাটে। যতবার মার ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করেন জগদীশ, শুনতে পান সুধাময়ী বিশুর সঙ্গে কথা বলছেন, 'ও আমার সোনা, ও আমার মানিক। বলি এত কান্না কিসের তোমার। হয়েছে হয়েছে আর অত ঠোঁট ফুলিয়ে তোমাকে কাঁদতে হবে না।'

জানলার ফাঁক দিয়ে জগদীশ দেখতে পান, লোল চর্মের ঝুলে পড়া দুটি স্তনের মধ্যে শিশুকে চেপে ধরেছেন সুধাময়ী। জগদীশকে দেখতে পেলে মাঝে মাঝে তিনি কাছে ডাকেন, 'ও জগু, পালাচ্ছিস কেন আয়, আয় না এ ঘরে। লজ্জা কি।'

জগদীশ সাড়া না দিয়ে সরে আসেন।

একদিন বিশুর একটু সর্দি আর জ্বরের মত হ'ল। তার পরিচর্যা নিয়ে সুধাময়ী এমন মেতে রইলেন যে, একটা বেজে গেল জগদীশ ভাত পেলেন না। তাঁর আর সহ্য হ'ল না। সুধাময়ীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমার মতলব আমি বুঝতে পেরেছি মা। তুমি এমনই ক'রে আমাকে জব্দ করতে চাও।'

সুধাময়ী একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'ছেলেটার অসুখ তাই রান্না করতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। তুই পিঁড়ি পেতে বস। আমি এক্ষুণি ভাত বেড়ে দিচ্ছি।'

জগদীশ বললেন, 'না, তোমার আর আমার জন্যে রেঁধেও দরকার নেই, বেড়েও দরকার নেই। তোমার হাতের রান্না খাওয়া এই আমার শেষ।'

রাগ ক'রে জগদীশ সেদিন এক হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলেন। পরদিন স্টোভ, হাঁড়ি ডেকচি, রান্নাবান্নার সব সরঞ্জাম কিনে নিয়ে এলেন। আনলেন চাল ডাল তেল কয়লা, ঘি মশলা। তারপর নিজেই রাঁধতে বসে গেলেন।

সুধাময়ী এসে গালে হাত দিয়ে বললেন, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুই আমার সঙ্গে পৃথক্ হয়ে খাবি?'

জগদীশ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে আমার আর পোষাবো না।'

সুধাময়ী অনেক চেঁচামেচি করলেন, কাঁদাকাটি করলেন। কিন্তু জগদীশ কিছুতেই নিজের গোঁ ছাড়লেন না। মনে মনে ভাবলেন, এইবার ঠিক হয়েছে। এইবার আচ্ছা জব্দ হয়েছে মা। এতদিনে প্রতিকারের মোক্ষম উপায়টি জগদীশ বের করতে পেরেছেন।

তিনদিনের দিনও জগদীশ যখন অনুরোধ শুনলেন না, আলাদাভাবে রান্না ক'রেই খেতে লাগলেন, সুধাময়ী তখন অতি কষ্টে ওপরে উঠে এসে ছেলেকে অভিশাপ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'বেশ, রেঁধে খাও, হোটেলে গিয়ে খাও, তোমার যা খুশি তাই কর। কিন্তু তোমার

মত বুড়ো ছেলের অন্যায় আব্দার পালতে গিয়ে আমি ওই দুধের বাচ্চাকে রাস্তায় ফেলে দিতে পারব না। তা তুমি জেনে রেখ।'

জগদীশের মনে হ'ল সুধাময়ী যেন তাঁর মা নন, শরিক মাত্র।

সুধাময়ী ছেলেকে আর খাওয়ার জন্যে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন না। মা আর ছেলে আলাদা রান্না ক'রে খেতে লাগলেন।

সেদিন স্ত্রীপুত্রের জন্যে নতুন ক'রে শোক অনুভব করলেন জগদীশ। ঘরের কোণে বসে দুই হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে সশব্দে কাঁদতে লাগলেন। সব হারাবার পর প্রথম ক'দিন যেভাবে কেঁদেছিলেন ঠিক তেমনি।

মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল। সুধাময়ী অবশ্য আপোস করবার জন্যে বারকয়েক এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু জগদীশ সাড়া দেননি। সাধাসাধির পর সুধাময়ী শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হয়েছেন।

জগদীশ আবার ঘর আর বারান্দায় নিজেকে বন্দী করলেন। কাচের আলমারীগুলি খুলে ফেললেন। দেশবিদেশের সাহিত্য দর্শন ইতিহাসের বই ঘরে ঘরে সাজানো। সব পড়েছেন। একাধিকবার পড়েছেন। আরো একবার পড়বার জন্যে প্রিয় দু' একখানা বই টেনে নিলেন। কিন্তু আগের মত পড়ায় আর মন বসে না। আগে এই বই পড়বার জন্যে স্ত্রীর কত খোঁটা সইতে হয়েছে। ছেলেমেয়ের কোলাহলের মধ্যেও বইয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকতে পেরেছেন জগদীশ। কিন্তু আজকাল আর কোন গোলমাল নেই, কোন ব্যাঘাত নেই, শান্ত স্তব্ধ ঘর। তবু পড়ায় মন বসে না জগদীশের। নীচে দু' একবার দিনের মধ্যে যেতেই হয়। যাতায়াতের পথে সুধাময়ীর গলা শুনতে পান, 'ও আমার সোনা, ও আমার মানিক। আর হাসির খই ছড়াতে হবে না তোমাকে। আমার ঘর যে ভরে গেল।'

জগদীশ ঘরে ফিরে এসে বই বন্ধ ক'রে নিজের মনে ভাবতে থাকেন —সুধাময়ীর ঘর ভ'রে উঠেছে কিন্তু তাঁর নিজের ঘর শূন্য। বিশুকে পেয়ে সুধাময়ী সব ভুলেছেন, সব পেয়েছেন। মেয়েমানুষ এমন অকৃতজ্ঞ হয়, এমন অল্পেই ভোলে বটে। কিন্তু জগদীশ তেমন নন। তিনি কিছুই ভোলেননি, কাউকে ভোলেননি। ভোলেননি যে নিজের

কাছে তার প্রমাণ দেওয়ার জন্যেই যেন তিনি বন্ধ ঘরগুলির তালা খুলে ফেললেন। তাদের শোয়ার ঘর, সুরতের ঘর, সুলেখার ঘর, তাঁর ভাই ভ্রাতৃবধূ আর তাঁর দুই ছেলের ঘর। সবগুলি ঘরে একবার ক'রে যান জগদীশ আর কিছুক্ষণ ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রত্যেকটি ঘর যেন এক একখানি যাদুঘর, স্মৃতির সমুদ্র, তাদের ব্যবহারের সব জিনিস, চেয়ার টেবিল খাট আলমারী এমনকি আলনায় ঝুলানো জামাগুলি পর্যন্ত আছে, শুধু তারা নেই। কে বলে যে নেই। জগদীশ তাদের সবাইকে যাদুঘরে বন্দী করে রেখেছেন। কিন্তু হঠাৎ যেন ধ্যান ভেঙে যায় জগদীশের। নিচে সুধাময়ী কার সঙ্গে কথা বলছেন, 'ও আমার সোনা, ও আমার যাদু—।'

চমকে ওঠেন জগদীশ। সুধাময়ীর গলা কি এত ওপরে এসে পৌছায়? না খানিকক্ষণ আগে বাথরুমে যাওয়ার সময় সুধাময়ীকে আদর করতে শুনে এসেছিলেন জগদীশ। মনের দেয়ালে দেয়ালে সেই প্রতিধ্বনিই এখন ধাক্কা খাচ্ছে। কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়েন জগদীশ। তাঁর মত সুধাময়ীও তাহ'লে যাদুঘর খুঁজে পেয়েছেন। অনেকগুলি ঘর নয়, একখানি মাত্র ঘর। স্মৃতি সম্বল যাদুঘর নয়, তাঁর সোনাজাদুর ঘর।

'হঠাৎ জগদীশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, এক দুঃসহ অস্থিরতা বোধ করলেন শিরায় শিরায়। সুধাময়ী জিতে গেছেন। জগদীশের চেয়ে বেশি বুড়ো হয়েও জগদীশের মত সব হারিয়েও শুধু মেয়েমানুষ হওয়ার ফলে সুধাময়ী আবার সব পেয়েছেন। কিন্তু জগদীশ তাঁকে জিততে দেবেন না। তিনি তাঁর শত্রুকে, তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে গলা টিপে মেরে ফেলে সুধাময়ীকে তাঁরই মত ফের নিঃস্ব রিক্ত ক'রে দেবেন।

ক্ষিপ্তের মত, পানাসক্তের মত সিঁড়ি ডিঙিয়ে স্খলিত পায়ে জগদীশ মায়ের ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

সুধাময়ী তাঁর মুখের ভাব লক্ষ্য করলেন না। কারণ তাঁর চোখ ছিল বিশুর ওপর; দশ মাসের শিশু তক্তপোশের ওপর জোড়াসনে বসেছে। সুধাময়ী সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আয়

জগু, তোকে আমিই ডাকব ভেবেছিলাম। দেখ, কেমন সুন্দর বসতে শিখেছে বিশু। তুমি কিন্তু ওই বয়সে অমন ক'রে বসতে পারতে না বাপু। তোমার সবই দেরিতে দেরিতে হয়েছিল।'

জগদীশ জবাব না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সুধাময়ী নিজের মুখে বলো যান, 'জানিস, এরই মধ্যে তিনটি দাঁত উঠেছে। সোনা, তোমার দাঁতগুলি দেখাও দেখি, দাঁত দেখাও।'

বিশু সঙ্গে সঙ্গে তিন চারটি সাদা ছোট দাঁত বার করে।

জগদীশ কঠিন মুখে গম্ভীর হয়ে থাকেন।

সুধাময়ী বলে চলেন, 'জানিস্, এরই মধ্যে আবার বোলও ফুটেছে। বেশ কথা বলতে পারে শয়তানটা। বিশু, সোনা আমার, মানিক ডাক দেখি। ডাক, ডাক।'

একটুকাল গম্ভীর হয়ে থাকবার পর বিশু সুধাময়ীর অনুরোধ রক্ষা ক'রে ডেকে ওঠে, 'মা মা, মা মা, !'

সুধাময়ী খিল খিল ক'রে হেসে ওঠেন, 'দূর বোকা ছেলে। কাল তোকে কি শেখালুম। মা নয় রে, বল ঠামা ঠামা। বল। বাবা বা বা বা। ওই তো পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখতে পাচ্ছিস নে? বল, আবার বল বা বা বা বা।'

বিশু হাসিমুখে কলকণ্ঠে প্রতিধ্বনি ক'রে 'বা বা বা বা।'

জগদীশের দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তিনি এগিয়ে এসে সুধাময়ীকে বুকে চেপে ধরে শিশুর মতই ডেকে ওঠেন, 'মা মা।'

চিঠিখানা লেখা শেষ করে বিপিনবাবু নিজে একবার মনে মনে পড়ে নিলেন তারপর স্ত্রী আর ছেলেকে ডেকে শোনালেন :

"পরম কল্যাণীয়েষু,

বাবা পরিতোষ, সেদিন তোমার কলেজ হইতে মনে বড় আনন্দ লইয়া ফিরিয়াছি। যাহাকে ছেলেবেলায় স্কুলে পড়াইয়াছি, নিজের হাতে বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিয়াছি, অসতর্কতা, অমনোযোগিতার জন্য কত তিরস্কার ভর্ৎসনা করিয়াছি, আবার যাহার ঐকান্তিক বিদ্যানুশীলনের গর্বে বুক ভরিয়া উঠিয়াছে, যাহার অনন্য-সাধারণ কৃতকার্যতায় অপার আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছি, আমার সেই পরিতোষ আজ কলিকাতা মহানগরীর একটি বিশিষ্ট কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক। এ যে আমার কত গর্ব তাহা তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে। কৃতীছাত্রের মুখ দেখিলে হৃদয়ে যে কি আনন্দ, সুখের উদয় হয় তাহা তো তোমার না জানিবার কথা নয় বাবা। কারণ তুমিও তো শিক্ষকের বৃত্তিই গ্রহণ করিয়াছ। প্রতি বৎসর শত শত সহস্র সহস্র ছাত্র ছাত্রী তোমাকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছে। সে গৌরবে আমারও অংশ আছে।

তোমার অধ্যাপনার খ্যাতি আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি। তোমাদের কলেজে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম কি উদ্দেশ্যে জান? ভাবিয়াছিলাম গোপনে গোপনে তোমার কোন একটি ক্লাসের পিছনের বেঞ্চে বসিয়া, তরুণ ছাত্রদের সঙ্গে মিশিয়া তোমার লেকচার শুনিব। প্রথম বয়সে শিক্ষকের আসনে বসিয়া যাহাকে উপদেশ দিয়াছি আজ এই শেষ জীবনে ছাত্রের আসন হইতে তাহার সাহিত্যালোচনা শুনিতে বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাথাভরা পাকা

চুল, আর মুখভরা সাদা দাড়ি গোঁপ লইয়া সেই জাতমাত্র শ্মশ্রু তরুণদের মধ্যে গিয়া বসিতে সাহস হইল না। তাহা ছাড়া এমন আশঙ্কাও হইল, তুমি হয়ত অপ্রস্তুত হইবে, আমাকে ওই অবস্থায় দেখিলে তুমি হয়ত লজ্জা পাইবে। তাই মনের সাধ অপূর্ণই রহিল। উপায় কি পরিতোষ, দরিদ্র শিক্ষকের জীবনের এমন কত সাধ কত আশা আকাজ্ক্ষাই তো অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তাহা লইয়া দুঃখ করিয়া হইবে কি। পিতৃপিতামহের ভিটা ছাড়িয়া আসিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া এই জবর দখল কলোনীতে কি অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে যে দিন কাটাইতেছি তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয় বাবা। তবু কিছু কিছু সেদিন বলিয়াছি। যাহা বলি নাই তাহা তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করিয়া লইয়াছ। সেই কার্তিকপুরের হাইস্কুল ছাড়িয়া আসিয়া বহুদিন কর্মহীন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। বর্তমানে কর্ম একটি জুটিয়াছে। এই কলোনীরই একটি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছি। বেতন যৎসামান্য, তাহাও নিয়মিত পাই না। তবু এরই মধ্যে একটি মেয়ের বিবাহ কোনক্রমে দিয়াছি। কিন্তু ছেলেটিকে আশানুরূপ লেখাপড়া শিক্ষা দিতে পারি নাই। তাই তাহার কর্মের সংস্থানও হইয়া উঠিতেছে না। এসকল কথা তোমাকে সেদিনও বলিয়াছি। সেই একই দুঃখের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিতেছি বলিয়া বিরক্ত হইও না। সেদিন তোমার ক্লাসে যাইবার খুব তাড়া ছিল, সেই ব্যস্ততার মধ্যে যদি সব কথা তোমার ভাল করিয়া শুনিবার অবকাশ না হইয়া থাকে তাই নিজের সেই পুরাতন দুঃখের কথাগুলিই আর একবার বলিয়া লইলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিয়া শেষ করিব এমন সাধ্য কি, আমার কপাল মন্দ। তাই তোমার মত একজন স্নেহভাজনের কোমল হৃদয়কেও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছি। কি করিব বাবা, অসুখ বিসুখ লইয়া এমনই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি যে আর কূল কিনারা পাইতেছি না। নাবালক তিনটি পুত্র কন্যাই শয্যাশায়ী, গৃহিণীর কথা বলিয়া আর কাজ নাই। মৃত্যুর পূর্বে তাহার শয্যা লইবার অবসর হইবে না। গরীবের সংসারে অমনিতেই সুখের সীমা নাই তারপর আবার যদি অসুখ আসিয়া দেখা দেয় তাহা হইলে কি অবস্থা হয় তাহা অনুমান

করিতে পার। তাই বড় সংকোচের সঙ্গে একটি কথা তোমাকে বলিতে বসিয়াছি। আবার ভাবি তুমি পুত্রস্থানীয়, তোমার কাছে বলিতে সংকোচই বা কিসের। মাসের শেষে হাত বড় টানাটানি যাইতেছে পরিতোষ। ঔষধপত্রের জন্য গোটা পঁচিশেক টাকার বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমার পুত্র শ্রীমান বিজনকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। তুমি যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিও। আগামী মাসে যদি নাও পারিয়া উঠি পরবর্তী দুই এক মাসের মধ্যেই আমি ইহা পরিশোধ করিয়া দিব। আর এক কথা। শ্রীমান বিজনের জন্য যদি কোন একটা কাজ-কর্মের সুবিধা করিয়া দিতে পার তাহা হইলে বড়ই উপকার হয় বাবা। তুমি আমার একজন কৃতী ছাত্র। শুধু গর্বের নয়, ভরসারও স্থল। আমি জানি কত দরিদ্র ছাত্র তোমার আনুকূল্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। বাল্যকালের একজন নিঃস্ব শিক্ষকও যে তোমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে না এ বিশ্বাস আমার আছে। আশীর্বাদ করি বিদ্যার সঙ্গে, ধনের সঙ্গে তোমার হৃদয়-সম্পদেরও দিনের পর দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, তুমি সুখী হও।
আশা করি বউমা ও শ্রীমান শ্রীমতীদের লইয়া সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছ। তাহাদের সঙ্গে তোমাকেও আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানাই।

ইতি—
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী।”

পড়া হয়ে গেলে স্ত্রী আর ছেলের দিকে তাকিয়ে বিপিনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেমন হয়েছে?’
অন্নপূর্ণা গালে হাত দিয়ে এতক্ষণ স্বামীর অসুবিধা শুনছিলেন। এবার মৃদু স্বরে মন্তব্য করলেন, ‘মন্দ হয়নি। তবে অত কথা কেন লিখতে গেলে? অত ইনিয়ে বিনিয়ে লিখবারই বা কি দরকার ছিল? দু’চার লাইনে লিখে দিলেই হ’ত।’
বিজনও বলল, ‘সত্যি! মাত্র পঁচিশটি টাকার জন্যে অত বড় লম্বা চিঠি—’

বিপিনবাবু চটে উঠলেন, 'পঁচিশ টাকা কম হ'ল বুঝি? যদি বলি পঁচিশটি পয়সা নিয়ে আয় জোগাড় ক'রে, আনতে পারবি নিজের চেষ্টায়। তোমার ক্ষমতার যে কি দৌড় তা আমার আর জানতে বাকি নেই।'

অন্নপূর্ণা ছেলের পক্ষ নিয়ে বললেন, 'আঃ ওকে কেন অত বকছ। ওর কি দোষ। টিউশনি ফিউশনি যখন ছিল তখন বিজুও তো পঁচিশ ত্রিশ টাকা মাসে মাসে রোজগার করেছে। আর সব টাকাই তোমার হাতে এনে দিয়েছে। ওর কি সাধ কাজ কর্ম না করে বেকার হয়ে ঘুরে বেড়ায়? চাকরি বাকরি না জুটলে ও কি করবে। ওকে দুষলে লাভ নেই, দোষ আমাদের কপালের।'

বিপিনবাবু একটু নরম হয়ে বললেন, 'হুঁ।'

বিজন এই সুযোগে ফের প্রতিবাদ জানাল, 'তাছাড়া তাঁরা কাজের মানুষ। অত বড় চিঠি পড়বার সময় আছে নাকি তাঁদের? চিঠিটা একটু সংক্ষেপে লিখলে তাঁদের পক্ষে সুবিধে হয়।'

বিপিনবাবু বললেন, 'থাক বাপু থাক। তাঁদের সুবিধে তোমাকে আর দেখতে হবে না। নিজেদের সুবিধে কিসে হয় তাই দেখ! এখন সন্ধ্যের আগে আগে ভালোয় ভালোয় কলকাতায় রওনা হয়ে পড়। টাকা ক'টা আদায় করে না আনতে পারলে তো কাল থেকে আর হাঁড়ি চড়বেনা উনুনে।'

মুখখানা হাঁড়ির মত ক'রে কল্‌কেতে তামাক ভরতে লাগলেন বিপিনবাবু।

অঘ্রান মাসের মাঝামাঝি, এই খোলা মাঠের মধ্যে বিকেলের দিকে বেশ শীত পড়ে। বাক্স পেঁটরা ঘেঁটে অন্নপূর্ণা কোত্থেকে বহুদিনের পুরোন একটা সোয়েটার বের ক'রে দিয়েছেন বিপিনবাবুকে। ক'দিন ধ'রে তাই গায়ে দিচ্ছেন তিনি। কয়েকটা জায়গায় বড় বড় ফুটো হ'য়ে গেছে সোয়েটারটার। তার ভিতর দিয়ে ময়লা গেঞ্জিটা চোখে পড়ছে। খাটো কাপড়খানা হাঁটুর নিচে আর নামেনি। মুখে দু'তিন দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি জমেছে। মাথার চুল বেশির ভাগই পেকে সাদা হ'য়ে গেছে। বিজনের মনে পড়ল সেদিন বয়সের হিসেব ওঠায়

বাবা বলেছিলেন তাঁর বয়স একষট্টি। কিন্তু দেখায় যেন আজকাল আরো বছর দশেক বেশি। অভাব অনটন আর জরার ভরে নুয়ে পড়া বাবার সেই জীর্ণ শরীরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন মমতা বোধ করল বিজন।

আস্তে আস্তে ডাকল, 'বাবা।'

বিপিনবাবু মালসা থেকে ছোট একটা চিমটের সাহায্যে কল্‌কেতে ঘুঁটের আগুন তুলছিলেন, ছেলের ডাক শুনে তার দিকে তাকালেন, 'কি বলছিস।'

বিজন বলল, 'আমি তাহলে রওনা হই। বেলা তো আর বেশি নেই, গোটা চারেক বাজে।'

বিপিনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ তা বাজে বোধহয়। হুঁকোটা দে তো এগিয়ে।'

একটু দূরে বাঁশের খুঁটিতে ছোট্ট হুঁকোটি ঠেস দেওয়া রয়েছে। বিজন সেটি এগিয়ে দিতেই বিপিনবাবু বললেন, 'চিঠিটা একটু লম্বা হয়ে গেছে নারে? খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে ফের লিখে দেব?'

বিজন বলল, 'না বাবা তাতে দেরি হ'য়ে যাবে। থাক না যা আছে বেশ আছে।'

হুঁকোয় ছু'একটি টান দিয়ে বিপিনবাবু দাঁত বার ক'রে হাসলেন, বললেন, 'বেশ আছে? সত্যি বলছিস?'

সাদা ঝকঝকে স্থন্দর ছু'পাটি দাঁত। অমন তোবড়ানো মুখে এমন তাজা সব দাঁত কেমন যেন একটু বিসদৃশ লাগে। এ দাঁতগুলি বিপিনবাবুর নিজস্ব নয়। তাঁর আর একজন প্রাক্তন ছাত্রের দান। ডেন্টিস্ট অনিমেষ রায় ভূতপূর্ব শিক্ষকের ক্ষয়ে যাওয়া নড়বড়ে দাঁতগুলি তুলে ফেলে এই নতুন দাঁতের সেট বসিয়ে দিয়েছে। এই দাঁত দিয়ে বিপিনবাবু সজনের ডাঁটা আর মাছের কাঁটা সবই চিবুতে পারেন, স্ত্রীপুত্রের ওপর রাগ হ'লে প্রায় আগের মতই কিড়মিড় ক'রে দাঁতে দাঁত ঘষতেও পারেন, আবার কদাচিৎ মন যখন প্রসন্ন হয়ে ওঠে বাঁধানো দাঁতের সাহায্যে হাসতেও কোন অস্থবিধে হয় না।

কিন্তু শুধু বাঁধানো দাঁত বলেই নয় আজ বাবার মুখের এই হাসি অন্য

কারণেও বিসদৃশ লাগল বিজনের। কালকের খাবারের সংস্থান যাঁর ঘরে নেই তিনি আজ এমন ক'রে হাসেন কোন্ মুখে, কোন্ আক্কেলে? ছেলের গম্ভীর মুখ দেখেও বিপিনবাবু ফের একটু হাসলেন, বললেন, 'জানিস বিজু, আমার সেই পুরোনো ছাত্রদের কাছে যখন চিঠি লিখি আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে যাই। লেখার সময় এ কথা মনেই হয় না আমি সামান্য টাকার জন্যে দয়া ভিক্ষে ক'রে তাদের কাছে চিঠি লিখতে বসেছি। জানিস, স্কুলে কলেজে পড়বার সময় আমারও একটু একটু লেখার শখ ছিল। চিঠি লেখার সময় সেই নেশা যেন আমাকে ফের পেয়ে বসে।'

অন্নপূর্ণা বিকালের কাজে হাত দিয়েছিলেন, ঘর ঝাঁট দিয়ে হ্যারিকেনটা পরিষ্কার ক'রে তাতে তেল ভরলেন। তারপর একফাঁকে স্বামীকে এসে তাড়া দিয়ে বললেন, 'আর বক্ বক্ না ক'রে ছেলেটাকে এবার ছেড়ে দাও। ও চলে যাক। যাদবপুর থেকে সেই মানিকতলা, রাস্তা তো কম নয়। যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তারপর আজ যদি কিছু জোগাড়-টোগাড় ক'রে না আনতে পারে তাহ'লে কাল—'

বিজন বলল, 'তুমি ভেবনা মা, কালকের অবস্থা যে কি হবে তা তো নিজেই জেনে গেলাম। বেরোচ্ছি যখন, কিছু না কিছু জোগাড় না ক'রে আর ফিরব না।'

বিপিনবাবুও আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তুমি ভেবনা বিজুর মা, আমার চেয়ে ছেলে আরো ওস্তাদ। মানুষের মনের মধ্যে কি ক'রে ঢুকতে হয় সে বিদ্যা ওকে শিখিয়ে দিয়েছি। বুড়ো মানুষ, আমাকে দেখলে তাদের মনে যতটা দয়া না হয় বিজুকে দেখলে, ওর কথা শুনলে—'

বিজন বাধা দিয়ে বলল, 'ওসব কথা থাক বাবা।'

বিপিনবাবু আবার একটু হাসলেন, 'আচ্ছা তাহ'লে থাক।' তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ছেলে লজ্জা পাচ্ছে। ও বয়সে আমিও ওইরকমই ছিলাম। কিছু ভাবিসনে বাবা। তোকে নিজের মুখে বেশি কিছু বলতে হবে না। চিঠিটা এমন ভাবে লিখেছি যে, তা যে পড়বে তারই চোখ দিয়ে জল বেরোবে।'

বিজন আর কোন কথা না বলে চিঠিখানা হাতে নিল। ওপরের পিঠে পরিষ্কার ক'রে বিপিনবাবু পরিতোষ রায়ের নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছেন। একবার সেদিকে চোখ বুলিয়ে পাঞ্জাবির বুক পকেটে রাখল চিঠিটা। তারপর বারান্দা থেকে উঠানে নামল।

এই জবরদখল কলোনীর চার কাঠা জমি ভাগে পড়েছে বিজনদের। আশেপাশের প্রতিবেশীরা ওই জমিতেই কেউ কেউ দু'তিনখানা ঘর তুলেছে। কিন্তু বিপিনবাবুর একখানার বেশি ঘর তোলবার সামর্থ্য হয়নি। উঠানে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। সেই জমিতে মূলো-বেগুনের চাষ করেছেন বিপিনবাবু। ফলন যে বেশি হয়েছে তা নয়। তবে ঘরে যখন আর কিছুই থাকে না দু'টো মূলো তুলে নিয়ে অন্নপূর্ণা ভাতে দেন, কি একটা বেগুন পুড়িয়ে দেন ছেলে-মেয়েদের পাতে। মাছ তরকারি কেনবার মত পয়সা প্রায়ই থাকে না। কোন রকম দু'টি চালের সংস্থান করতে পারলে তরকারির জন্যে আর ভাবেন না অন্নপূর্ণা।

উঠানে নেমে সেই মূলোর ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বিজন হঠাৎ বলল, 'মা, গোটাচারেক মূলো আমার এই রুমালখানায় বেঁধে দাও দেখি।'

অন্নপূর্ণা অবাক হ'য়ে বললেন, 'ওমা: চার চারটে মূলো দিয়ে কি করবি তুই?'

বিজন বলল, 'পরিতোষবাবুর জন্য নিয়ে যাবো। বলব আপনার বুড়ো মাস্টারমশাই, তাঁর নিজের ক্ষেতের মূলো পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

বিপিনবাবু খুশী হয়ে বলে উঠলেন, 'দেখেছ ছেলের বুদ্ধি? মূলোর কথাটা তো আমার মনেই হয় নি! দাও বিজুর মা দিয়ে দাও। আর ভয় নেই, বিজু আমার পারবে। কি ক'রে বড়লোকের মন ভেজাতে হয় ও তা শিখে ফেলেছে।'

অন্নপূর্ণা বললেন, 'আমার হাত আটকা, তুই নিজেই তুলে নে।'

বিজন ক্ষেত থেকে বেছে বেছে চারটে মূলো তুলে নিল। তারপর রুমালে ভালো ক'রে সেগুলিকে বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল টাকা ধারের চেষ্টায়।

কলোনীর বাইরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় বিজনের হাফপ্যান্ট-পরা

ছুই ভাই শিবু আর নন্থ আর ফ্রকপরা বার তের বছরের বোন লীলা সমবয়সীদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলছিল, বিজনকে দেখে কাছে এগিয়ে এল, 'কোথায় যাচ্ছ দাদা ?'

লীলা বলল, 'দাদা শহরে যাচ্ছ বুঝি ? আমার জন্য একগজ কাপড় এনো।'

বিজন সেকথার কোন জবাব না দিয়েব লল, 'তোরা এবার ঘরে যা, ঠাণ্ডা লাগবে।' শীত পড়েছে, কিন্তু শীতবস্ত্র ওদের গায়ে ওঠে নি, পুরোন পাতলা জামা। তাও ছিঁড়ে গেছে।

খানিকটা পথ হেঁটে বিজন গিয়ে বাসে উঠলো, আজ যে ভাবেই হোক পরিতোষবাবুর কাছ থেকে টাকা তাকে সংগ্রহ ক'রে আনতেই হবে। পুরো পঁচিশ টাকা না হোক দশ পনের যা তিনি দেন তাই নিয়ে আসবে বিজন। নইলে কাল আর সংসার চলবে না।

বছরখানেক ধরে এই ভাবেই চলেছে বিজনদের। কলোনীর প্রতিবেশীদের কাছে হাত পাতলে আর কিছু মেলে না, আত্মীয়স্বজন চেনাজানা বন্ধুবান্ধব কারো কাছ থেকেই যখন নতুন কিছু আর প্রত্যাশা করবার নেই সেই সময় গড়িয়াহাটার মোড়ে পুরোন ছাত্র নিরঞ্জন সেনগুপ্তের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল বিপিনবাবুর। বিজন সেদিনও বাবার সঙ্গেই ছিল। দূর সম্পর্কের আত্মীয় অমিয় মুখুয্যে সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন। থাকেন রাসবিহারী এভিনিয়ুতে। ছেলের চাকরির উমেদারির জন্যে বিপিনবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি চা-টা খাইয়ে আপ্যায়ন ক'রে তারপর বললেন, 'কি যে বলেন বিপিনদা, কত বি এ পাশ এম এ পাশ ছেলে চাকরি চাকরি ক'রে হায়রান হয়ে যাচ্ছে আর একটি আই এ ফেল ক্যাণ্ডিডেটের জন্যে আমি কোথায় কাকে ধরব। যার কাছে যাব সে-ই তো বলবে—তার চেয়ে আমি বলি কি, ও আবার কলেজে ভর্তি হোক। ডিগ্রীটি নিয়ে যদি বেরোতে পারে তখন—।'

বিপিনবাবু মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'সে আর সম্ভব নয় ভাই। ছেলেকে ফের কলেজে পড়াব আমার সে সঙ্গতি কোথায়—।'

অমিয়বাবু বলেছিলেন, 'বেশ তাহ'লে টেকনিক্যাল কিছু শিখুক, কি কোন একটা দোকানপাট দিয়ে বসুক।'

চাকরি ছাড়া আরো নানারকম জীবিকার সন্ধান অমিয়বাবু বিজনকে দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে সাধ্যমত সাহায্য করবার কথাও বলেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই আর হয়ে ওঠে নি।

বিমর্ষমুখে অবসন্ন মনে ছেলেকে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলছিলেন বিপিনবাবু, হঠাৎ স্যুট-পরা সুদর্শন সাতাশ আঠাশ বছরের এক যুবককে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে আমাদের নিরু না? নিরঞ্জন ও নিরঞ্জন।'

যুবকটি রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল, ডাক শুনে ফিরে তাকালো তারপর খানিকটা এগিয়ে এসে বিপিনবাবুর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে হেসে বলল, 'ও আমাদের মাস্টার মশাই।"

মাথা নিচু ক'রে হাত বাড়িয়ে পায়ের ধূলো নেওয়ার ভঙ্গি করল নিরঞ্জন, তারপর ফের সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'চেহারা টেহারা একেবারে বদলে গেছে যে মাস্টার মশাই, প্রথমে দেখে তো চিনতেই পারিনি। এত বুড়ো হ'য়ে গেলেন কি করে?' বিপিনবাবু বললেন, 'আর বাবা বুড়ো হব তাতে আর বিচিত্র কি। যা ঝড় ঝাপটা যাচ্ছে, তাতে এখন পর্যন্ত টিকে যে আছি—'

নিরঞ্জন স্মিতমুখে বলল, 'কি যে বলেন মাস্টার মশাই, আপনি এখনো অনেককাল বাঁচবেন। এমন কি আর বয়স হয়েছে আপনার, চুলটা একটু বেশি পেকে গেছে অবশ্য। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল দাঁত। দাঁতগুলি যদি বাঁধিয়ে নেন, আর যদি ভালো ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারেন তাহ'লে দেখবেন দু'মাসের মধ্যে আপনার চেহারা ফিরে গেছে।'

বিপিনবাবু বললেন, 'তা তো বুঝলুম। কিন্তু কোত্থেকে দাঁত বাঁধাব বাবা, জানাশোনা তো কেউ নেউ—।'

নিরঞ্জন বলল, 'আজ্ঞে এই রাসবিহারী এভিনিয়ুতে আমারই চেম্বার আছে। যদি বলেন আমিই সব ঠিক ঠাক ক'রে দিতে পারি।'

বিপিনবাবু উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'তাহ'লে তো বাপু ভালোই হয়।

গরীব মাস্টারের দাঁতগুলি তুমি যদি বাঁধিয়ে দাও তাহ'লে তো বেঁচে যাই বাবা। সকলের মুখে শুনি দাঁতের মধ্যেই আজকাল জীবন। দাঁত খারাপ থাকলে নানারকমের রোগব্যাধি এসে ধরে। তুমি নিজে দাঁতের কারবারী তুমি সবই জান। তবে খরচপত্তর আমি কিন্তু তেমন কিছু দিতে পারব না নিরু। যদি কিছু কর গরীব মাস্টারের ওপর দয়াধর্ম করেই তোমাকে করতে হবে।'

একথা শোনার পর একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ডেন্টিস্টের মুখ। তবে মুহূর্তকাল বাদেই সেই অপ্রসন্ন মুখে হাসি টেনে নিরঞ্জন বলেছিল, 'আচ্ছা তা নিয়ে কোন চিন্তা করতে হবে না আপনাকে। কাল আসবেন, আমার চেম্বারে।'

বিপিনবাবু একা পথ চিনে যেতে পারবেন না। তাছাড়া দাঁত তোলার ব্যাপারে তাঁর ভয়ও আছে। তাই বিজনই বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। দু'দিন একদিন নয়, দিন পনেরই লেগেছিল সবশুদ্ধ। টুইশনের সময় বাঁচিয়ে বাবাকে রোজ তাঁর সেই ডেন্টিস্ট ছাত্রের চেম্বারে নিয়ে যেত বিজন। নড়ে যাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া অবশিষ্ট দাঁতগুলি তুলে ফেলে নিরঞ্জন মাস্টারমশাইর দু'পাটি দাঁতই বাঁধিয়ে দিল। বিপিনবাবু কোঁচার খুঁট খুলে একখানি দশ টাকার নোট তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর বেশি আমার সাধ্য নেই বাবা, তুমি যদি দয়া করে—'

নিরঞ্জন হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'ওর দরকার নেই মাস্টারমশাই। ও আপনি রেখে দিন। ছেলেবেলায় আপনার কাছে লেখাপড়া শিখেছি—।'

বিপিনবাবু অভিভূত হ'য়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'তা তো হাজার হাজার ছাত্রই শিখেছে বাবা। কিন্তু তোমার মত ক'জন ছেলে সেকথা মনে রাখে। ক'জনে এমন করে গুরুদক্ষিণা দিতে জানে। ক'জনের এতবড় হৃদয় আছে। এ যুগে যে দৃষ্টান্ত তুমি দেখালে বাবা—।'

নিরঞ্জনের সব রকমের সমৃদ্ধি কামনা করে বিপিনবাবু ছেলেকে নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

সেই দাঁত থেকেই শুরু। নিরঞ্জনের কাছ থেকে আরো কয়েকজন

প্রাক্তন ছাত্রের ঠিকানা পেলেন বিপিনবাবু। তাদের মধ্যে দাঁতের ডাক্তার অবশ্য আর কেউ হয়নি। তবে সবাই চাকরি বাকরি নিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দু'একজন উকিল প্রফেসর মোটা মাইনের সরকারী চাকুরেও তাদের ভিতর থেকে বেরোল। আর ছেলের হাত ধ'রে পুরোন ছাত্রদের কাছে গিয়ে হানা দিতে লাগলেন বিপিনবাবু। প্রত্যেকের কাছে যান, সেই পুরোন স্কুলের গল্প করেন। তারপর দাঁত বার ক'রে দেখান একজন ভক্তিমান কৃতজ্ঞ ছাত্র কিভাবে গুরুদক্ষিণা দিয়েছে। প্রথম দিন তিনি আর কোন দক্ষিণা দাবী করেন না। শুধু বিজনের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের পরিচয় করিয়ে দেন আর বলেন, 'তোমার এই দাদাদের মত হও। যেপথে এরা বড় হয়েছে সেই পথে চল। ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতার চেয়ে সংসারে যে বড় কিছু আর নেই তা এদের কাছ থেকে শিখে নাও।'

দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন দেখা ক'রে বিজনের জন্যে একটি চাকরি প্রার্থনা করেন বিপিনবাবু। তারপর থেকে নিজে আর আসেন না। ডবল ট্রাম বাসের ভাড়া দিয়ে আর লাভ কি। বিজনই বাবার লেখা হাত চিঠি নিয়ে তার পুরোন ছাত্রদের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়। কারো কাছে চাকরির উমেদারী, কারো কাছে বিশ পঁচিশ টাকা ধারের জন্যে আবেদন, কারো কাছে বা আরো পাঁচ জন ছাত্রের ঠিকানা চেয়ে চিঠি লেখেন বিপিনবাবু। সব জায়গায় সমান সাড়া পাওয়া যায় না। অনেক ছাত্রই পত্রপাঠ বিদায় করে। কি বড়জোর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেয়। নগদ বিদায় অনেকের কাছ থেকেই মেলে না। আবার কারো কারো কাছ থেকে মেলেও। সেই দুর্লভ গুরুভক্তদের সন্ধানেই ঘুরে বেড়াতে হয় বিজনকে। তাছাড়া আর উপায় কি।

প্রথম প্রথম ভারি লজ্জা করত, ভারি সংকোচ হ'ত বিজনের। কিন্তু এখন আর হয় না। এখন নিজেদের দুঃখ দুর্দশার কথা অতিরঞ্জিত ক'রে বলবার ক্ষমতা বাবার চেয়েও বিজনের বেড়ে গেছে। অবশ্য দিনের পর দিন যা অবস্থা হ'চ্ছে তাতে আর অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হয় না। সত্যকথা বললেই বিপিনবাবুর ছাত্ররা তাকে অতিরঞ্জিত

বলে মনে করে। অবশ্য ধার চাইলে কারো কারো কাছ থেকে যে দু'পাঁচ টাকা না মেলে তা নয়। কিন্তু যার কাছ থেকে বিজনরা নেয় ফের আর তার কাছে যেতে পারে না। কারণ ধার আর শোধ দেওয়া হয় না। কিন্তু বিপিনবাবুর সহৃদয় প্রাক্তন ছাত্রেরা তো আর অসংখ্য নয়। তাই তাদের সংখ্যাও একদিন স্বাভাবিক ভাবে কমে আসে। তবু নানা অজুহাতে বিজন গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে। বাবা মা-ই ঠেলে পাঠিয়ে দেন। কাকে দিয়ে কোন উপকার হবে বলা যায় না। বাড়ি বসে থেকে কি হবে। বরং যারা চাকরি বাকরি করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে দেখাসাক্ষাৎ করলে একটা হদিশ এক সময় মিলেও যেতে পারে। নিদেনপক্ষে দু'একটা টুইশন জুটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

বিজনও সেই আশায় ঘোরাঘুরি করে। বাবার পুরোন ছাত্রদের কারো বা বাসায় কারো বা অফিসে গিয়ে দেখা ক'রে বলে, হাত ঠেকা বলে ধারের টাকাটা বিপিনবাবু এমাসে শোধ দিতে পারলেন না; সেজন্য ছাত্রের কাছে তিনি বড়ই লজ্জিত হ'য়ে রয়েছেন।

উত্তমর্ণ ছাত্রেরা মুখে সৌজন্য দেখিয়ে বলে, 'তাতে কি হয়েছে। মাস্টার মশাইকে বলো তিনি যেন এ নিয়ে কিছু মনে না করেন, সামান্য টাকা, যখন সুবিধে হয় দেবেন।'

মনে মনে তারা বোধহয় এই ভেবে আশ্বস্ত হয়, আগের টাকা শোধ না দিয়ে বিজনরা দ্বিতীয়বার ধার চাইতে পারবে না, যা গেছে তার জন্যে ক্ষোভ করা ছেড়ে ভবিষ্যতে বিজনদের জন্যে যে আর কিছু যাবে না সেই ভেবেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। এই বছর দেড়েকের মধ্যে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছে বিজন। কে কি প্রকৃতির মানুষ, কার কাছ থেকে কি পাওয়া যাবে না যাবে তা দু'চার মিনিটের মধ্যেই সে বুঝতে পারে।

প্রত্যাশা ক্ষীণ হ'য়ে এলেও বিজন তাদের কাছে মাঝে মাঝে যায়। হবে না জেনেও চাকরির জন্যে অনুরোধ করে। বাবার কোন' পুরোন ছাত্র হয়ত ভদ্রতা ক'রে এক কাপ চা খাওয়ায়, আবার কেউ বা শুধু সংক্ষেপে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেই নিজের ফাইল পত্রের মধ্যে ডুবে

যায়। বিজন চালাক হ'য়ে গেছে। সে ইঙ্গিত যেন সে বুঝেও বোঝে না। টিফিনের সময়ের জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে। তারপর অনিচ্ছুক দাতার চা আর খাবারে ভাগ বসায়। ভাবখানা যেন এই 'যে স্বেচ্ছায় দেবে না তার কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে পার কেড়ে নাও। বেশি কাড়বার ক্ষমতা তোমার নেই। কিন্তু যেটুকু তোমার প্রাপ্য সেটুকুও যে না কাড়লে পাবে না।'

এমনি ক'রে কারো কাছ থেকে এক কাপ চা কারো কাছ থেকে একটি সিগারেট, কারো অফিস থেকে একটা ফোন করবার সুবিধে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যখন বিজনের চলেছে, বাবা তাঁর আর একটি কৃতী ছাত্রের সন্ধান পেয়ে গেলেন।

পরিতোষ এতদিন মেদিনীপুরের এক মফঃস্বল কলেজে পড়াত, চেষ্টা চরিত্র ক'রে কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছে। তার ঠিকানা পেয়ে বিপিনবাবু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে একদিন তার কলেজে দেখা করতে গেলেন। বিপিনবাবুর প্রথম জীবনের ছাত্র পরিতোষ রায়, তার বয়সও বছর পঁয়তাল্লিশ হয়েছে। সৌম্যদর্শন শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। বিপিনবাবুকে দেখেই চিনতে পারল পরিতোষ। নিজের একদল ছাত্রের সামনেই হেঁট হয়ে তার পায়ের ধুলো নিল। বিপিনবাবুর চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে দেখে দুঃখ জানাল। বিজনের সঙ্গেও বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করল। এত অল্প বয়সে পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে জেনে সহানুভূতি প্রকাশ করল পরিতোষ। নিজেই এক সময় প্রস্তাব করল, 'তুমি ফের কলেজে ভর্তি হয়ে যাও না। প্রিন্সিপালকে ধ'রে যতটা সম্ভব সুবিধে সুযোগ ক'রে দেওয়া যায় তার চেষ্টা করব।'

বিপিনবাবু হেসে বললেন, 'বাবা তুমি যখন এখানে রয়েছ সুবিধের জন্যে আমার ভাবনা কি। কিন্তু পড়বে যে, কি খেয়ে পড়বে। যদি দিনের বেলায় একটা কাজকর্ম কিছু জুটত তাহ'লে রাত্রে নিশ্চিন্তে এসে ক্লাস করতে পারত। তুমি তেমন কিছু একটা জুটিয়ে দিতে পার কিনা সেই চেষ্টা ক'রে দেখ।' একথা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল পরিতোষ, বলেছিল, 'বড় কঠিন সমস্যা মাস্টার মশাই। আজকাল

অনেকেই এসে কাজ কর্মের কথা বলেন। কিন্তু কারো জন্যই কিছু ক'রে উঠতে পারি নে। আমাদের কতটুকুই বা সাধ্য কতটুকুই বা শক্তি। তবু জানা রইল। যদি খোঁজ খবর কোথাও পাই, নিশ্চয়ই আপনাকে জানাব।'

বিপিনবাবুরা বিদায় নেওয়ার আগে পরিতোষ কলেজের বেয়ারাকে ডেকে বড় এক ঠোঙা মিষ্টি আনাল। সিঙ্গারা, নিমকি, রসগোল্লা, সন্দেশ।

বিপিনবাবু মনে মনে খুশী হলেন, কিন্তু মুখে একটু আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'এসব আবার কি, দেখ দেখি কাণ্ড!'

কলেজ কম্পাউণ্ডের বাইরে এসে বিপিনবাবু ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন 'পরিতোষকে তোর কেমন মনে হ'ল রে।'

বিজন বলল, 'ভালোই তো।'

বিপিনবাবু বললেন, 'ছেলেটি ভাল, উপকার টুপকার পাওয়া যাবে কি বলিস?'

মনুষ্য চরিত্র বিশেষজ্ঞ বিজন বলল, 'হ্যাঁ, দু'দশ টাকা ধার চাইলে মিলতে পারে।'

এই ধার চাওয়ার উপলক্ষ আরো আগেই কয়েকবার এসেছিল। কিন্তু সবাই মিলে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। হাত পাতবার মত ওই একটি মাত্র স্থান, একটি মাত্র পাত্রই যখন আছে, সহজে তা নষ্ট করা যায় না। কিন্তু এমাসে প্রায় সপ্তাহখানেক ধ'রে বিজন আরো বহু জায়গায় চেষ্টা করেছে, বাবার পুরোন বহু ছাত্রের কাছে গেছে। নিজের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছেও ঘোরাঘুরি করেছে কোথাও কোন সুবিধে ক'রে উঠতে পারেনি। আজ তাই পরিতোষ রায়ই একমাত্র সম্বল। যেমন করেই হোক বাবার চিঠি দেখিয়ে নিজেদের দুঃখদুর্দশা আর বানানো অসুখ বিসুখের সকরুণ বর্ণনা ক'রে পরিতোষ-বাবুর কাছ থেকে পঁচিশটা টাকা তার আদায় ক'রে নিয়ে যেতেই হবে। বিজন একবার ভাবল বাবার চিঠিতে যেখানে পঁচিশ লেখা আছে সেটা কেটে ওখানে পঞ্চাশ টাকা বসিয়ে দেবে কি না। কারণ যা নেওয়ার তাতো একবারই নেবে। বাবার অন্যান্য ছাত্রদের বেলায়

যা হয়েছে এখানেও তাই হবে। ধারের টাকা শোধ দেওয়া যাবে না, দ্বিতীয়বার এসে কিছু চাইতেও পারবে না বিজন। কিন্তু টাকার অঙ্কটাকে দ্বিগুণ করতে শেষ পর্যন্ত আর সাহস হল না বিজনের। মাসের এই তৃতীয় সপ্তাহে যদি অত টাকা না দেন পরিতোষবাবু। তাছাড়া দান তো শুধু দাতার ক্ষমতার ওপরই নির্ভর করে না, পাত্রের যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্নও সে ক্ষেত্রে আছে। বিজনদের চেহারা দেখে আর অবস্থার কথা শুনে পঞ্চাশ টাকা ধার দেওয়ার মত সাহস কি কারো হবে? তাই ও লোভ সম্বরণ করাই ভালো।

মাণিকতলার মোড়ে এসে স্টেট-বাসের ভিড় ঠেলে নেমে পড়ল বিজন। পকেট ডায়েরি খুলে রাস্তার নাম নম্বর দেখে নিল! বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। পূবমুখে ব্রীজের দিকে খানিকটা এগোতেই বাঁ দিকের ফুটপাতে গোলাপী রঙের দোতলা ফ্লাট বাড়িটা চোখে পড়ল। গায়ে আঁটা নম্বরটাও। সন্ধ্যা উতরে গেছে। রাস্তার দু'দিকের বাড়িগুলির জানালার ভিতর দিয়ে ঘরের আলো দেখা যায়। সিঁড়ি বেয়ে সোজা দোতলায় উঠে গেল বিজন। তারপর পাঁচ নম্বর ফ্লাটের দরজায় কড়া নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টেপার শব্দ হল, শব্দ হ'ল খিল খোলার তারপর শোনা গেল মধুর একটু কণ্ঠ, 'কে!'

একটি তন্বী, শ্যামবর্ণা মেয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বয়স সতের আঠের হবে। বিজন চেয়ে দেখল, শুধু গলার স্বরই মিষ্টি নয়, চেহারাটিও মিষ্টি। কালো চোখ আর কোমল চিবুক যেন মৃদু স্বরে লাবণ্যে মাখা, বিজন বলল, 'পরিতোষবাবু আছেন?'

'বাবা? না ওঁরা তো একটু আগে বেরিয়ে গেলেন। আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

মেয়েটির চোখে কৌতূহল। সে কৌতূহলে জীবনের উচ্ছলতা।

বিজন একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'অনেক দূর থেকে। কোথায় গেছেন আপনার বাবা?'

'বেশি দূর নয় কাছেই। সিমলায় আমার পিসেমশাইর বাড়ি, সেখানে গেছেন। বাবা মা দু'জনেই বেরিয়েছেন। বেশি দেরি হবে না। ন'টার মধ্যেই ফিরবেন। আসুন না, ভিতরে আসুন।'

এমন সৌজন্য বিজন আর কোথাও দেখে নি, আশ্চর্য, কথা এমন মধুর হয় কি করে।

দ্বিতীয় বারের অনুরোধে মেয়েটির পিছনে পিছনে ঘরের মধ্যে ঢুকল বিজন। অনুগামী হওয়ায় যে এত সুখ তা এতদিন কল্পনারও বাইরে ছিল। সদর দরজা আলগোছে ভেজিয়ে দিয়ে সরু প্যাসেজ পার হয়ে মেয়েটি বাঁ দিকের একটি ঘরে ঢুকল। তারপর একখানা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

ছোট্ট সাজানো সুন্দর একটি ড্রইংরুম। খান কয়েক নিচু চেয়ার। একটি সোফা। খোলা র‍্যাকে আর দু'টি তালাবন্ধ আলমারি বইতে একেবারে ঠাসা। দেয়ালে দু'খানি মাত্র ফটো। একখানা রবীন্দ্রনাথের আর একখানা গান্ধীজীর। ডান দিকে ছোট একটি টেবিল। তাতে ফুল তোলা ফিকে নীল রঙের টেবিল ঢাকনি। কালো মলাটের বাঁধানো একখানি বই উপুড় করা। বেশ বোঝা যায় মেয়েটি এতক্ষণ এখানে বসে পড়ছিল। একটু বাদে মেয়েটি স্মিতমুখে বলল, 'রুমালে বাঁধা আপনার হাতে ওটা কি। দিন না আমি রেখে দিচ্ছি।'

বিজন লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না আমিই রাখছি।'

পুঁটলিটা নামিয়ে রাখবার কথা এতক্ষণ মনেই ছিল না বিজনের, এবার সে পায়ের কাছে মূলোর পুঁটলিটা রেখে দিল।

মেয়েটি এগিয়ে এসে পুঁটলিটা তুলে নিয়ে বলল, 'আহা ওখানে রাখলেন কেন? কি এর মধ্যে? বড় বড় পাতা দেখা যাচ্ছে।'

বিজন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'ও কিছু নয়। সামান্য কয়েকটা মূলো। আমাদের ক্ষেতের।'

মেয়েটি প্রসন্ন স্বরে বলল, 'মূলো? দেখা যাচ্ছিল কিন্তু সাদা সাদা ফুলের মত।'

বিজন ভাবল ফুল হলেই ভাল হ'ত।

মেয়েটি বলে চলল 'আপনাদের নিজেদের ক্ষেতের না? জানেন আমারও মাঝে মাঝে ক্ষেতে ফুল ফলের চাষ করতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু এখানে ক্ষেত কোথায় পাব বলুন? টবেই সাধ মেটাতে হয়। কিছু মনে করবেন না, আপনি কি আমার বাবার ছাত্র?'

বিজন একটু হাসল, 'না, আপনার বাবাই বরং আমার বাবার ছাত্র ছিলেন।'

'ও। ভাবতে কি অদ্ভুত লাগে আমার বাবাও একদিন ছাত্র ছিলেন,' বলে মেয়েটি হাসল। সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট দাঁত।

একটু বাদে সে আরো বলল, 'আপনি বসুন। র‍্যাক থেকে বই টই নিয়ে দেখুন বরং। আমার আবার সামনেই পরীক্ষা। প্রি-টেস্ট। পড়াশুনো কিচ্ছু হয়নি। সেইজন্যেই বাবা সঙ্গে নিলেন না।'

মেয়েটি টেবিলের ওপর থেকে বইটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। কিন্তু কেউ চলে গেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারো কারো চলে যাওয়ার ছন্দ থেকে যায়। ঘরের মধ্যে চুলের গন্ধ, শাড়ির গন্ধ, গায়ের গন্ধ ভাসতে থাকে।

বিজন চুপ ক'রে চেয়ারটায় বসে রইল। সময় কাটাবার জন্যে র‍্যাক থেকে কোন বই তুলে নিতে তার ইচ্ছা হ'ল না। এই ছন্দে ভরা গন্ধে ভরা কয়েকটি মুহূর্ত শেষ হয়ে ফুরিয়ে যাক তা যেন বিজন চায় না। ভারি স্নিগ্ধ মেয়েটির স্বভাব; ভারি মধুর ওর কথা বলবার ভঙ্গি। আর সে আছে ওই পাশের ঘরেই, একটি বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে শুধু বিজন আর একটি অপরিচিতা মেয়ে। অপরিচিতা, কিন্তু সেই অপরিচয়ের ব্যবধান দুস্তর নয়, মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপে তারা পরস্পরের কাছে পরিচিত হ'য়ে গেছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত কেউ কারো নাম জানে না। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। বাবার পুরোন ছাত্রদের সকলের নামইতো বিজনের মুখস্থ। কিন্তু শুধু নাম জানলে কতটুকুই বা জানা যায়। আবার নাম না জানলেও কতটুকুই বা জানতে বাকি থাকে।

পাশের ঘরের দরজায় সবুজ রঙের পর্দা দুলছে। সবখানি ঢাকা নয় একপাশে ফাঁক আছে একটু। সেই ফাঁকটুকু দিয়ে খানিকটা দেখা যাচ্ছে মেয়েটিকে। পরীক্ষার্থিনীর হাতে বই, কিন্তু মন যে বইতে নেই

তা তার দ্রুত পাতা ওলটাবার ধরন দেখেই বুঝতে পারছে বিজন। পাশের ঘর থেকে একটি ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ভারি অদ্ভুত লাগছে বিজনের। চাকরির উমেদারী আর টাকা ধারের জন্যে বাবার ছাত্রদের খোঁজ ক'রে ক'রে টালা থেকে টালীগঞ্জ আর বালী থেকে বেলেঘাটা কত জায়গাতেই না ঘুরে বেড়িয়েছে বিজন। কিন্তু এমন একটি রঙিন মধুর অপূর্ব সন্ধ্যা জীবনে কই আর তো কোন দিন আসে নি।

একটু বাদে মেয়েটি আবার এসে দাঁড়াল 'আপনার একা একা ব'সে থাকতে ভারি অসুবিধে হচ্ছে না?'

বিজন বলল, 'ওঁরা যে কত দেরি করবেন তা কে জানে?'

'আপনাকে তখন বলিনি, ওঁদের একটু বেশি দেরিই বোধহয় হবে।'

বিজন বলল, 'কেন।'

মেয়েটি একটু হাসল, 'আমার পিসতুতো বোনের বিয়ের সম্বন্ধ চলছে। আজই পাকাপাকি হওয়ার কথা তাই পিসেমশাই ওঁদের খবর দিয়েছেন।'

বিজন বলল, 'ও।'

মেয়েটি হঠাৎ বলল, 'দেখুন কাণ্ড, আপনি এতক্ষণ ধ'রে বসে আছেন এক কাপ চা পর্যন্ত করে দেইনি। মা শুনলে আচ্ছা বকুনি লাগাবেন।'

বিজন বলল, 'না না চা থাক। আপনার মিছিমিছি সময় নষ্ট হবে।'

মেয়েটি বলল, 'কিছু নষ্ট হবে না। এক কাপ চা করতে আর কতটুকু সময় লাগবে। আপনি বসুন। এক্ষুণি আসছি আমি।'

খানিক বাদে সাদা সুন্দর একটি কাপে চা ক'রে নিয়ে এল মেয়েটি। দামী চা, স্বাদে এবং সৌরভে অপূর্ব। একি চায়ের স্বাদ, না একটি মনোরম সন্ধ্যার স্বাদ, না পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ, বাইশ বছরের তরুণ বিজনের পক্ষে তা স্থির করা দুঃসাধ্য হল। কখন মেয়েটি আবার এসে দাঁড়িয়েছে। সে বিজনের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'আপনার বোধহয় দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, না? কিন্তু ওঁরা এক্ষুণি এসে পড়বেন। ন'টা বাজল, বাবা এসে পড়বেন।

ন'টার কথাই তিনি বলে গেছেন। তিনি খুব পাংচুয়াল।' কিন্তু একথা শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিজন উঠে দাঁড়াল। যেন হঠাৎ তার কি একটা জরুরী কাজ মনে পড়ে গেছে।

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওকি ?'

বিজন বলল, 'আমি এবার চলি। আমার বাস বন্ধ হ'য়ে যাবে।'

মেয়েটি একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলল, 'ওদিকবার বাস এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয় নাকি। কিন্তু কতদূর থেকে বাবার সঙ্গে দেখা করবেন বলে এলেন, অথচ দেখা হ'ল না—।'

'আপনার সঙ্গে তো দেখা হ'ল।' কথাটা মনে মনে বলল বিজন। তাকে দোরের বাইরে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে মেয়েটি বলল 'কি দরকারে এসেছিলেন তা তো কিছু বলে গেলেন না। বাবাকে কি বলব।'

বিজন জবাব দিল, 'বলবেন, অমনি দেখা করতে এসেছিলাম। আমার নাম বিজন, বিজন চক্রবর্তী।'

মেয়েটি স্মিতমুখে বলল, 'আর তো কেউ নেই। আমরা নিজেরাই নিজেদের ইনট্রডিউস করিয়ে দিই। আমার নাম সুনন্দা, সুনন্দা রায়। আর একদিন আসবেন, বাবাকে বলে রাখব।'

বিজন মাথা নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর দ্রুতপায়ে একেবারে রাস্তায় নেমে পড়ল।

বাবার চিঠিটা এখনো পকেটের মধ্যে ভারি হয়ে রয়েছে। রাত পোহালে একসের চাল কিনবার মত পয়সা নেই ঘরে। যত দেরিই হোক পরিতোষবাবুর জন্যে অপেক্ষা করে তারপর তাঁর হাতে বাবার চিঠি পৌঁছে দিয়ে পুরো পঁচিশ না হোক দশ পাঁচ যা পাওয়া যায় তাই ধার ক'রে নিয়ে যাওয়াই বিজনের উচিত ছিল।

কিন্তু সব সময় সব উচিত কাজে কি মন সায় দেয়। সারা শহরের মধ্যে একটিমাত্র ঘর একটিমাত্র পরিবারও কি তার জানা থাকবে না যেখানে বিজন চাকরির উমেদার হ'য়ে আসবে না, যেখানে সে ধারের টাকার জন্য হাত পাতবে না, শুধু মাঝে মাঝে একটি কি দু'টি গন্ধঘন আলোজ্বলা সন্ধ্যা বিনা দরকারে এসে কাটিয়ে যাবে!

আস্তে আস্তে সার্কুলার রোডের দিকে এগুতে লাগল বিজন। আর কোন উপায়ই কি নেই ?

এই পৃথিবীভরা মরুভূমির মধ্যে এক ছিটে স্নিগ্ধ শ্যামল ওয়েসিসকে বাঁচিয়ে রাখবার মত আর কোন উপায়ই কি বিজন খুঁজে বার করতে পারবে না ?

রার বাবা গণেশ দত্ত ছিলেন আমাদের জেলা স্কুলের মাষ্টার। আমরা এক পাড়াতেই থাকতাম, আমার বাবা ছিলেন জজ কোর্টের উকিল। ওখানে ছোট খাট একটু বাড়িও আমাদের ছিল। কিন্তু গণেশবাবুরা ছিলেন ভাড়াটে বাসায়। অনেকগুলি ছেলেপুলে নিয়ে কষ্টেই ছিলেন। মীরা তাঁর মেজো মেয়ে। শামলা রঙ, দোহারা লম্বাটে গড়ন; মুখ চোখের শ্রী-ছাঁদ ভালই। দেখলে পলক পড়ে না এমন অবশ্য নয়, আবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ারও দরকার হয় না। রাস্তার এপারে ওপারে সামনাসামনি বাড়ি হওয়ায় জানালা দিয়ে ওদের ঘর সংসারের অনেক দৃশ্যই আমাদের চোখে পড়ত। কখনো দেখতাম রুগ্না মায়ের বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছে মীরা, কখনো বাপের পিঠে তেল মালিস করছে, ঠাঁই করে খেতে দিচ্ছে ভাইদের, কোনদিন বা ছোট বোনকে কোলে নিয়ে পিঠ চাপড়ে তার কান্না থামাচ্ছে—চোখে পড়ত। আবার এই সব কাজের এক ফাঁকে ওকে বইপত্র নিয়ে স্কুলে বেরোতেও দেখতাম। আর সে বইও দু' একখানা বই নয়, একরাশ বই হাতে ও ঘাড় গুঁজে পথ হাঁটত। পাড়ার বকাটে দু' একটি ছোকরা ঠাট্টা করে বলত—'ইস্, পল্লবিনী লতা একেবারে নুয়ে পড়েছে।'

মীরা কারো দিকে তাকাত না, পাড়ার কোন ছেলে আলাপ করতে চাইলে এড়িয়ে যেত। এইজন্যে অনেকেরই রাগ ছিল ওর উপর।

আমার মা কিন্তু বলতেন, 'মেয়েটির গুণ আছে রে। সংসারে এত কাজকর্ম করেও ক্লাসে ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়। মেয়েটি পড়াশুনোয় ভাল।' পড়াশুনোয় আমিও নেহাৎ খারাপ ছিলাম না। তবু মার মুখে অন্য একটি মেয়ের বিদ্যার প্রশংসা শুনে কেমন যেন আমার একটু হিংসে

হত। হেসে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'ক'জনের মধ্যে সেকেণ্ড হয় মা?'

মা বলতেন, 'যতজনই হোক্ দু'জনের চেয়ে বেশি ছাত্রী নিশ্চয়ই ওদের ক্লাসে আছে। কেন, ওর উপর তোর এত রাগ কিসের রে?' মা হাসতেন।

একটু রাগ ছিল বই কি। মীরা আমার সমবয়সী হয়েও আমার চেয়ে দু' ক্লাস নীচে পড়ে। সেই হিসেবে ওর একটু শ্রদ্ধামনোযোগ আকর্ষণের দাবি কি আমার নেই? মীরা আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যে আসে যায় তা আমি জানি। মার কাছ থেকে গোপনে গোপনে পাঁচ দশ টাকা ধার নেয়, আবার গোপনেই তা শোধ দিয়ে যায়। মা ছাড়া যেন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই বাড়িতে।

আমি একদিন বললাম, 'মীরা বড় অহংকারী, না মা?'

মা হেসে বললেন, 'নারে, মেয়েটি বড় লাজুক, আজকালকার মেয়েদের মত বেটাছেলের সঙ্গে ও বেশী মেলামেশা করতে জানে না।'

কিন্তু এই মীরাই ম্যাট্রিকুলেশনে সেবার ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়ে শহরের সবাইকে অবাক করে দিল। পাড়ার অনেকেই বলাবলি করতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, মেয়ে বটে একখানা গণেশ দত্তের। এ মেয়ে যে পরীক্ষায় ভাল করবে তা তাঁরা সবাই জানতেন।'

রেজাল্ট বেরোবার পর গণেশবাবু মেয়েকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে এলেন। আমার বাবা-মাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, 'ও'দের প্রণাম কর।'

আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। মীরা ওঁদের প্রণাম সেরে উঠতেই গণেশবাবু আমাকেও ইশারায় দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু সেই উপরি পাওনা প্রণামটি থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন মা। এক সঙ্গে মীরা আর তার বাবাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ও কি? পরিমল মীরার চেয়ে ছ' মাসের ছোট। ওকে আবার প্রণাম কিসের। ছি ছি।'

ধমক খেয়ে মীরা একটু পিছিয়ে গেল।

গণেশবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'ও, পরিমল বুঝি বয়সে ছোট। কিন্তু তাতে কি হলো বউঠান, পরিমল বামুনের ছেলে, মীরার চেয়ে কত বেশী উপরে পড়ে, কত বেশী বিদ্যেবুদ্ধি রাখে। সংসারে বয়সটাই তো আর সব নয়?'

সেইদিন মীরার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ও বলল, আমার ইণ্টারমিডিয়েটের সব বই আর নোট-ফোটগুলি ওর চাই। আমিও তাই চাইছিলাম। চাইছিলাম, ও আমার কাছ থেকে বইপত্র সব চেয়ে নিক।

মীরা আমাদের কলেজে ভর্তি হল। তার বছর দুই আগে থেকে কলেজে কো-এডুকেশন চলছে। আমার ইচ্ছে ছিল বি এ টা কলকাতায় এসেই পড়ি। কিন্তু বাবা মা ছাড়ছেন না। প্রফেসাররাও আমাকে আটকে রাখলেন। তাই বছর দুই মীরার সঙ্গে একই কলেজে পড়বার আমার সুযোগ হয়েছিল। তখন থেকেই মেধাবিনী ছাত্রী হিসেবে ওর নাম ছড়াতে শুরু হয়েছে। শুধু ছাত্রদের কমনরুমেই নয়, প্রফেসারদের ঘরেও ওকে নিয়ে আলোচনা হয়। কলেজ ম্যাগাজিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ওর প্রবন্ধ বেরোয়। সে রচনার শ্রেষ্ঠতা নিয়ে অধ্যাপক মহল মুখর হয়ে ওঠেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুধু একটামাত্র অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে শোনা যায়। মীরা বড় অমিশুক। বই আর পড়াশুনো ছাড়া ওর মুখে অন্য কোন কথা নেই। ইউনিয়নের ইলেকশনে ওকে পাওয়া যায় না, কলেজের উৎসব-অনুষ্ঠানে ও গরহাজির থাকে। মীরা একেবারে গতানুগতিক অর্থে ভাল ছাত্রী।

আমি একদিন ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কাল আমাদের থিয়েটারে এলে না কেন। সবাই যে তোমার নিন্দে করছে। বলছে দাম্ভিক আর অহংকারী।'

মীরার মুখে একটু বিষণ্ণতার ছাপ পড়ল, আস্তে আস্তে বলল, 'কি করব বল। মায়ের মাথার অসুখ কাল যে খুব বেড়ে গিয়েছিল। আমি ছাড়া মাকে যে কেউ সামলাতে পারে না।'

নানা রকম অসুখে ভুগে ভুগে মীরার মার মাথায় ছিট হয়েছিল।

মাঝে মাঝে তিনি একেবারে উদ্দাম হয়ে উঠতেন। কিন্তু এ কথাটা মীরাদের বাড়ির কেউ প্রকাশ করতে চাইত না। মীরা সেদিনই আমাকে প্রথম সব খুলে বলল।

আই এ'তেও কয়েকটি লেটার আর স্কলারশিপ নিয়ে মীরা থার্ড ইয়ারে উঠল। আর আমি ফিলসফিতে একটি সেকেণ্ড ক্লাশ অনার্স জুটিয়ে কলকাতায় এসে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম।

ছুটি-ছাটায় যেতাম আমাদের শহরে। আর মীরার সুখ্যাতির কথা শুনতাম। সেবার এসে শুনলাম আমাদের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে মীরার বেশ একটু আলাপ হ'য়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেলীর তুলনা করে মীরা কলেজ-ম্যাগাজিনে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। তাই নিয়ে দু-একজন প্রফেসারের আলোচনা শুনে প্রিন্সিপ্যাল সতীকান্ত ঘোষাল সেটা দেখতে চান। প্রবন্ধটি পড়বার পর মীরাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেন করলেন, 'ওটা কি তোমার নিজের লেখা! কোত্থেকে টুকেছ তাই বল।'

মীরা নতমুখে জবাব দিয়েছিল, 'আপনার লেকচার নোটের সাহায্য নিয়ে ওটা আমি নিজেই লিখেছি।'

প্রিন্সিপ্যাল স্থিরদৃষ্টিতে মীরার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা যাও। ক্লাসে যাও।'

এর পর মীরাকে আর একদিন ডেকে প্রিন্সিপ্যাল হঠাৎ ওকে ভাল করে পড়াশুনো করে ইংরেজীতে একটি ভাল অনার্স নিয়ে বেরবার জন্যে উৎসাহ আর উপদেশ দিয়েছেন।

খবরটা আমরা বেশ উপভোগ করলাম। কারণ অধ্যয়নে-অধ্যাপনায় সতীকান্ত ঘোষালের যে কিছুমাত্র মনোযোগ আছে তা আমরা ইদানীং ভুলেই গিয়েছিলাম। বছর দশেক ধরে বিষয়, আশয়, প্রভাব, প্রতিপত্তির দিকে তাঁর এমন নজর পড়েছিল যে, কলেজের দিকে মন দেওয়ার তাঁর অবসরও ছিল না, উৎসাহও ছিল না। সতীকান্ত না আছেন হেন জায়গা নেই। জেলা বোর্ডের পলিটিকসে তিনি রয়েছেন, বেনামীতে কয়েকটি রাস্তা তৈরির কনট্রাকট্ নেওয়ার কাজের মধ্যেও

তিনি আছেন। শহরের 'বাণী প্রেস'টি কিনে নিয়ে তিনি তাঁর স্বত্বাধিকারী হয়েছেন। খুব লাভ হচ্ছে প্রেসের ব্যবসায়। জুনিয়র প্রফেসর, এমন কি ছাত্রদের নিয়ে নোট লিখিয়ে তিনি নিজের নামে তা বাজারে চালাচ্ছেন, তাতেও বেশ পয়সা আসছে। কলকাতার দু-তিনটি নামজাদা প্রকাশকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। শোনা যায়, সে সব কারবারে অংশও আছে তাঁর। এ ছাড়া ডুয়ার্সে চা-বাগানের শেয়ার আছে। মাঠে খামার জমির পরিমাণ তাঁর বেড়ে চলেছে। জলায় মাছের ব্যবসায়ে তাঁর টাকা খাটছে।

এই তো গেল সম্পত্তির কথা। এবার প্রতিপত্তির কথাটা বলি। শহরে প্রতিপত্তিরও তাঁর তুলনা নেই। থানা পুলিস থেকে শুরু করে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম। তিনি সবাইকে চেনেন। তাঁর বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তাও কারো চিনতে বাকি নেই। লোকের উপকার আর অপকারের দু রকম ক্ষমতাই তিনি রাখেন। তাই শহরসুদ্ধ লোকের তাঁর সম্বন্ধে এক চোখে শ্রদ্ধা আর এক চোখে ভয়।

শহরের অভিজাত পাড়া কলেজ রোডে তাঁর বড় দোতলা বসতবাড়ি। এছাড়া আরো খান দুই বাড়ি আছে। সেগুলি তিনি ভাড়া দিয়েছেন। ছেলেমেয়ে দুটি। দুজনেরই বিয়ে হয়েছে। ছেলে শুভেন্দু শহরের সবচেয়ে পসারওয়ালা উকিল মৃত্যুঞ্জয় মুখুজ্যের মেয়েকে বিয়ে করেছে। সে নিজেও জজকোর্টে ওকালতি করছে। মেয়ে শুভ্রাকে বিয়ে দিয়েছেন ধনী জমিদারের ঘরে। জামাই নীলাম্বর এম বি পাশ করেছে। ডাক্তারিতে তেমন সুবিধে না হলেও তার ফার্মেসি বেশ জেঁকে উঠেছে। ওষুধ বিক্রি করে খুবই লাভ করছে নীলাম্বর চাটুজ্যে।

আর এই সব ধনসম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তির কেন্দ্রে আছেন সতীকান্তের স্ত্রী হিরণপ্রভা। শোনা যায়, তিনিই স্বামীর এই বৈষয়িক উন্নতির মূলে। তাঁর বাবা ছিলেন গঞ্জের তেল-লবণের কারবারী। হিরণপ্রভা লেখাপড়া বেশি শেখেননি। কিন্তু বিদ্যার অভাব রূপ আর বুদ্ধি দিয়ে পূরণ করেছেন। তাঁকে দেখলে তাঁর কথাবার্তা শুনলে কিছুতেই মনে

করবার জো নেই তিনি কম লেখাপড়া জানেন। বাংলায় লেখা তাঁর চিঠিপত্র তাঁর বেয়াইর মুশাবিদাকে হার মানায়।

কিন্তু এমন প্রভাবশালী সতীকান্তেরও যে শত্রু নেই তা নয়। তারা আড়ালে আবডালে বলাবলি করে, তাঁর সব ঐশ্বর্যই সহজ পথে আসেনি। অনেকখানি বাঁকাচোরা পথে ঘুরে এসেছে। তারা বলে সতীকান্তের আর প্রিন্সিপ্যাল হয়ে না থাকাই ভাল। কারণ পড়ানর দিকে তাঁর মোটেই মন নেই। রুটিনে সপ্তাহে দু-তিনটে অনার্স ক্লাশ তাঁর থাকে। তাও তিনি সমানে করেন না। প্রফেসর কুণ্ডু, কি প্রফেসর ধরের উপর বরাত দিয়ে অন্য কাজকর্মে তিনি সরে পড়েন। পড়ানর চেয়ে তাঁর অনেক বড় আর জরুরী কাজ আছে। কলেজে ইংরেজী অনার্সের ফল সবচেয়ে খারাপ হয়। ছেলেদের ভাগ্যে দু-একটা কোন বার জোটে, কোন বার জোটেও না। কিন্তু তা নিয়ে কেউ কিছু প্রকাশ্যে বলতে পারে না। বলে লাভ নেই। কারণ গভর্নিং বড়ি প্রিন্সিপ্যালের হাতের মুঠোয়। শোনা যায়, এই বেসরকারী কলেজের বেশির ভাগ অংশই সতীকান্ত কিনে রেখেছেন। তাই তাঁর কাজকর্মের সমালোচনা করবে কে।

পঞ্চাশের উপর বয়স হয়েছে সতীকান্তের। কানের কাছে চুলে একটু একটু পাক ধরেছে। কিন্তু এখনো বেশ শক্ত জবরদস্ত চেহারা। রীতিমত লম্বা চওড়া। পুরু ঠোঁট, নাকটাও একটু চ্যাপটা। সুপুরুষ না হলেও স্বাস্থ্যবান পুরুষ। একটু যেন স্থূল রুক্ষ বৈষয়িক ধরনের মুখ। দেখলে প্রফেসার বলে সত্যিই আজকাল আর তাঁকে মনে হয় না। মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার আকারেও বোধ হয় কিছু অদল-বদল হয়। যাই হোক, শহরে যে কয়েকজন লোক লেখাপড়া ভালবাসতেন সতীকান্তের উপর ভিতরে ভিতরে তাঁদের খুব শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁরা বলতেন, প্রিন্সিপ্যালের জীবনের ধারাই যখন বদলে গেছে ওঁর জীবিকাটাও এবার বদলে নেওয়া উচিত।

তাই অনার্সের ছাত্রী মীরাকে ডেকে তাঁর উৎসাহ দেওয়ার কথা শুনে আমরা বিস্ময় আর কৌতুক বোধ করলাম।

তারপর মীরা একদিন প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে গিয়েও হাজির হল।

কদিন ধরে তিনি কলেজে আসেননা! কেউ বলে তিনি অসুস্থ, কেউ বলে তিনি জরুরী কাজে ব্যস্ত। এদিকে আর একজন ইংরেজীর প্রফেসারও ছুটিতে। অনার্স ক্লাসগুলি প্রায়ই বন্ধ যাচ্ছে। কোর্স শেষ হওয়ার কোন রকম লক্ষণ নেই, ক্লাসের আরো দুজন ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে মীরা গিয়ে হানা দিল প্রিন্সিপ্যালের দরজায়। কিন্তু সেখানে লাঠি হাতে গোঁফওয়ালা দুজন দারোয়ান। দু'দিন তারা হটিয়ে দিল মীরাদের। একদিন বলল বড়বাবু বাড়িতে নেই, আর একদিন বলল তাঁর বুখার হয়েছে। তৃতীয় দিনে সঙ্গীরা কেউ যেতে চাইলনা। বলল, 'আমাদেরও মান সম্মান আছে। আমরা তো আর চাকরির উমেদার নই। বাংলা দেশে কলেজ আরো আছে। সেখানে গিয়ে পড়ব।'

কিন্তু মীরা একটু অন্য ধরনের মেয়ে। তার জেদের ধরনটাও আলাদা। সে যখন সঙ্কল্প করেছে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করবে, তখন যেমন করে হোক সে তার প্রতিজ্ঞা রাখবেই। তাই সে তৃতীয় দিনেও বিকেল বেলায় এসে উপস্থিত হল। দারোয়ানদের অনুরোধ করে একটুকরো কাগজ আর পেন্সিল চেয়ে নিয়ে লিখল 'শ্রদ্ধাস্পদেষু—আমাদের অনার্স ক্লাশগুলি একেবারেই বাদ যাচ্ছে। আমি সেই সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।—জনৈকা ছাত্রী।'

এরপর প্রিন্সিপ্যাল তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। দোতলায় পূর্ব-দক্ষিণ খোলা একটি ঘর। সেখানে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল চুরুট টানছেন আর গম্ভীর ভাবে জরুরী একটা ফাইলের পাতা ওলটাচ্ছেন।

মীরা ঘরে ঢুকে ভীরু পায়ে আরও একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

সতীকান্ত মেয়েটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি। আমাকে এই পেনসিলে লেখা চিরকুট পাঠিয়েছ তুমি?'

মীরা সবিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের ক্লাশগুলি একেবারেই বাদ যাচ্ছে।'

সতীকান্ত বললেন, 'সে সব দেখবার অন্য লোক আছে। ভাইস-

প্রিন্সিপ্যাল আছে, অন্য প্রফেসাররা রয়েছে। তা নিয়ে তোমার কেন এত মাথাব্যথা, আমাকে এসব নিয়ে আর কোনদিন বিরক্ত করতে এসনা। সেই কথা বলবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম, যাও এবার।'

মীরা চলে আসছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সামনের ঘরের দরজার একটি পাট খোলা। তার ফাঁক দিয়ে বই বোঝাই কয়েকটা কাঁচের আলমারি দেখা যাচ্ছে।

মীরা বলল, 'আপনার লাইব্রেরিটা একটু দেখে যাব?'

সতীকান্ত এবার অবাক হলেন। এতখানি অপমান করবার পরও যে তার লাইব্রেরি দেখতে চায় সে কিরকমের মেয়ে। একটু নরম হয়ে বললেন, 'যাও দেখে এসো।'

মীরা লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল। ঘর ভরা আলমারি আর আলমারি ভরা বই, খোলা শেলফের মধ্যেও অনেক বই আছে। সাহিত্য ইতিহাস দর্শনে শেলফগুলি ঠাসা। কিন্তু কেউ কোন একখানা বইতে যে শিগগির হাত দিয়েছে তা মনে হয়না। দু' একখানা বই টেনে নিয়ে দেখল মীরা। ধুলোয় একেবারে ভর্তি। মীরা আঁচল দিয়ে খানকয়েক বইয়ের ধুলো মুছতে লাগল। হঠাৎ কিসের শব্দ হতেই মীরা পিছন ফিরে দেখল, কখন সতীকান্ত এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন। একটু দূরে থেকে তাকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন। কিন্তু তাঁর সেই দৃষ্টিতে আগের উগ্রভাব আর নেই। বরং কিসের একটা কোমলতা এসেছে। চোখাচোখি হতেই তিনি বললেন, 'কি করছিলে।'

মীরা চোখ নামিয়ে লজ্জিত ভাবে বলল, 'কিছু না।'

তারপর দুখানা বই ঠিক জায়গায় রেখে দিল মীরা। তৃতীয়খানা রাখতে যেন তার আর মন সরেনা। সতীকান্ত তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'বইটা তুমি নেবে? কি বই ওটা।'

মীরা তেমনি লজ্জিত স্বরে বলল, 'আমাদের সিলেবাসের রোমিও-জুলিয়েট। মার্জিনে মার্জিনে চমৎকার সব নোট রয়েছে। অনেকদিন আগের পেনসিলের লেখা। তবু বেশ পড়া যায়।"

'কই দেখি।' সতীকান্ত এগিয়ে এসে মীরার হাত থেকে বইখানা তুলে নিয়ে দু একটা পাতা উলটে পালটে দেখলেন। তারপর বইখানা ওর হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, 'নাও।'

হঠাৎ মীরা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই বুঝি আপনার সার্টিফিকেট ?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

মীরার মনে হল তিনি একটা নিঃশ্বাস চাপলেন।

আলমারির মাথার উপরে উঁচুতে সতীকান্তের ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হওয়ার সার্টিফিকেট বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। তার পাশে তাঁর প্রথম যৌবনের একখানি ফটো। মীরার চোখে পড়ল দুখানাতেই মাকড়সার ঝুল পড়েছে। সতীকান্তও তা লক্ষ্য করলেন।

একটু বাদে মীরা বেরিয়ে আসছিল, সতীকান্ত বললেন, 'তোমার আরো যদি বইয়ের দরকার হয়ে পরে এসে নিয়ো। আর এর আগে যা বলেছি তার জন্য কিছু মনে কোরোনা। আমি অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে বড়ই বিব্রত আছি।'

মীরা মাথা নিচু করে চুপ করে রইল।

সতীকান্ত বললেন, 'ভাল করে পড়াশুনো কর, রেজাল্ট খুব ভাল হওয়া চাই।'

মীরা বলল, 'তার জন্যে আপনার সাহায্য দরকার।'

সতীকান্ত বললেন, 'হুঁ।'

এই দেখা-সাক্ষাতের বিবরণ আমি মীরার কাছ থেকে শুনেছি। ছুটি-ছাটায় শহরে এসে, সতীকান্তের পরিবর্তন কিছু কিছু চোখেও দেখলাম। অন্য কাজ কর্মের কিছু কিছু ভার তিনি কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দিয়ে কলেজের উপর বেশী মনোযোগ দিচ্ছেন। প্রায় নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন, অন্য ক্লাসগুলিরও খোঁজখবর নেওয়ায় তাঁর উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তাঁর ভাষা আর ব্যবহার থেকে রূঢ়তা অনেকখানি কমেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য তিনি নিজেও ফের একটু একটু পড়াশুনো শুরু করেছেন। তাঁর ইজিচেয়ারটা আজকাল লাইব্রেরি ঘরেও মাঝে মাঝে পড়ে। অনেক রাত অবধি সে ঘরে আলো জ্বলে। প্রিন্সিপ্যালের

এই পরিবর্তনে সহকর্মীরা আর ছাত্রেরা সবাই খুশি হয়ে উঠল। এবার কলেজটার সত্যিই তবে উন্নতি হবে।

মীরার সঙ্গে সতীকান্তের স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূর ক্রমে আলাপ হয়ে গেল। মেয়ের বয়সী এই দরিদ্র মেয়েটির উপর প্রথমে স্বাভাবিক বাৎসল্যই বোধ করলেন হিরণপ্রভা। আরো যখন শুনলেন মেয়েটি ভাল ছাত্রী, ওকে দিয়ে তাঁর স্বামীর কলেজের সুনাম বৃদ্ধির আশা আছে, তখন মীরার উপর তাঁর আগ্রহ আরো বাড়ল। ইদানীং কলেজের দিক থেকে স্বামীর যশের ঘাটতি নজর এড়ায়নি হিরণপ্রভার। তিনি তাতে খুশি হননি। স্বামীর যশ সব দিক দিয়ে বেড়ে চলুক এই তাঁর কথা। তিনি মীরাকে ডেকে বললেন, 'কি বল, একটা ফার্স্ট ক্লাস পাবে তো!"

মীরা লজ্জিত ভাবে সবিনয়ে বলল, 'পাবো একথা কি বলা যায়। আপনাদের আশীর্বাদে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।'

হিরণপ্রভা বললেন, 'চেষ্টা কর, খুব ভাল করে চেষ্টা কর। ওঁর মুখ রাখা চাই বুঝেছ?'

তারপর বললেন, 'তোমার নাকি বাড়িতে পড়াশুনোর অসুবিধা। আলাদা ঘরটর নেই, তা ছাড়া আরো কি সব গোলমাল টোলমালের কথা শুনেছি। ইচ্ছে হলে তুমি আমাদের বাড়িতে এসেও পড়তে পার। এখানে তো ঘরের অভাব নেই। কত ঘর খালি পড়ে আছে।'

মীরা বলল, 'সবদিন দরকার নেই। তবে আপনাদের লাইব্রেরিটা যদি মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে পারি খুব ভাল হয়। কলেজের লাইব্রেরিতে ছেলেদের বড় ভিড়।'

হিরণপ্রভা মৃদু হেসে বললেন 'বেশ তুমি এখানেই এসে পড়ো।'

তাঁর অনুমতি পেয়ে মীরা মাঝে মাঝে আসতে লাগল প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে। সেই নিরালা লাইব্রেরি ঘরটি তার বড় ভাল লাগত। মনে হত এখানে যেন সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, আর কিছুর প্রয়োজন হয় না।

সতীকান্তের মেয়ে শুভ্রা মাঝে মাঝে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসত। আলাপ করতে আসত পুত্রবধূ জয়ন্তী। কিন্তু হিরণপ্রভাই

তাদের আগলে রাখতেন। তিনি বলতেন, 'না না, ওকে পড়তে দাও তোমরা ওর পড়াশুনোর ব্যাঘাত কোরোনা।'
শুভ্রা হেসে বলত, 'বাবা, কি কড়া পাহারা। মা, বাবার চেয়ে তুমি যদি কলেজের পিন্সিপ্যাল হতে আরো বেশী মানাত।'

মীরা ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেল, কলেজের বছর দশেকের ইতিহাসে তা কেউ পায়নি। অন্যান্য রেজাল্টও আগের চেয়ে কলেজের এবার বেশি ভাল হল।
মীরা কলকাতায় গিয়ে এম এ ক্লাসে ভর্তি হল। সাফল্যের আনন্দটা পুরোপুরি ভোগ করতে পারল না। বাসার অবস্থা খারাপ। মায়ের অসুখ কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে, আর্থিক অবস্থাও ভাল হচ্ছে না। কয়েকটি অপোগণ্ড ভাইবোন। শুধু একটি মাত্র ভাই বড় হয়ে উঠেছে। সুধীর বি এ পড়ছে।
মীরা বাবাকে বলল, 'বাবা, আমি না হয় না গেলাম। তোমাদের দেখা শোনা করবে কে।'
গণেশবাবু বললেন, 'সে যা হয় হবে। এত ভালো রেজাল্ট করে তুই পড়া ছেড়ে দিবি তাই কি হয়। তুই আমার বংশের রত্ন।'
মীরা পড়তে গেল কলকাতায়। বাবার কাছ থেকে তো কিছু নিত না। বরং সস্তা হস্টেলে থেকে কম খরচে চালাত। টুইশনের টাকা পাঠাত বাসায়।
নানা কাজে সতীকান্ত কলকাতায় যেতেন। মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়ে আসতেন মীরাকে, আর কিনে দিতেন বই।
একদিন দেখা হয়ে গেল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে। দেখি সতীকান্ত আর মীরা পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে। দুজনেই যেন ছাত্রছাত্রী। দুজনেরই হাতে বই। দুজনেরই মুখে গাম্ভীর্য, চোখে অধ্যয়নের স্পৃহা।
মীরা আমাকে দেখে উঠে এল, বলল 'ভাল আছ?'
বললাম, 'ভাল আর কই। এখনো বেকার। সেকেণ্ড ক্লাশ এম এ এর সহজে কি চাকরি হয়। তোমরা বুঝি মাঝে মাঝে আস এখানে?'

মীরা বলল, 'আমরা? ও প্রিন্সিপ্যালের কথা বলছ? হ্যাঁ, উনি কলকাতায় এলে মাঝে_মাঝে আমাকে নিয়ে আসেন। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের উপর উনি একটা বই লিখছেন।'
বললাম 'ভালই তো।'

কর্মখালিতে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করতে করতে আমি আরামবাগ কলেজে শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি পেয়ে গেলাম। মীরার রেজাল্ট এম এ'তে আশানুযায়ী হল না। হাই সেকেণ্ড ক্লাশ পেল। কলকাতার কলেজে ওর চাকরি জুটেছিল। কিন্তু এই সময় ওর মা মারা গেলেন। ওকে যেতে হল আমাদের শহরে ফিরে। গণেশবাবু একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁর স্বাস্থ্যও খারাপ।
প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'কাজ কি তোমার বাইরে থেকে। তুমি এই কলেজেই পড়াও। এখানে কলকাতার চেয়ে খরচ কম। তাছাড়া তুমি তো এই কলেজেরই মেয়ে। এর উপর তোমার দরদ বেশি থাকবে।'
গণেশবাবুর তাই মত। তিনি মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে চান না। আরো বছর দুই কাটলো। এর মধ্যে গণেশবাবু মারা গেলেন, আর সুধীর বি, এ ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়ে কোর্টে পেশকারের চাকরি নিল। শোনা গেল সতীকান্ত বাবুর চেষ্টাতেই এই চাকরি হয়েছে।
সেবার ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে আরো কিছু খবর শুনতে পেলাম। সতীকান্তবাবুর পরিবারে অশান্তি দেখা দিয়েছে। প্রায় রোজই ঝগড়া ঝাঁটি হচ্ছে। স্ত্রী ছেলে মেয়ে কারো সঙ্গেই তাঁর আর বনিবনাও হচ্ছে না।
মা'ই বললেন একথা।
জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন মা?'
মা বললেন, 'যাক বাপু, তোমার এসব নোংরা কথার মধ্যে থেকে কি দরকার।'
কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মা'ই জানালেন এসবের মূলে আছে মীরা। ওর জন্যেই পরিবারে অশান্তি। কলেজে মীরাকে চাকরি দেওয়া হয়

এতে গোড়া থেকেই হিরণপ্রভার অসম্মতি ছিল। স্বামীর সঙ্গে এই মেয়েটির অনুক্ষণ মেলামেশা তিনি আর পছন্দ করছেন না। সতীকান্ত বই লেখার নামে কি মীরাকে থিসিস লেখায় সাহায্য করার নামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয় কলেজে নয় লাইব্রেরিতে কাটান। তাঁদের আলাপ আলোচনা যেন শেষ হতেই চায় না। সতীকান্তের অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হয়, তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। এই মেলামেশা নিয়ে নানা জায়গায় কথাও উঠেছে, তাও যেন তিনি গ্রাহ্যে আনতে চান না। আসলে লোকটি একগুঁয়ে, বেপরোয়া ধরনের। কিন্তু পুরুষের না হয় অমন একগুঁয়ে হলেও চলে। বিশেষ করে সতীকান্তের মত খ্যাতিমান শক্তিমান পুরুষের। কিন্তু মীরার আক্কেলখানা কিরকম। কুমারী মেয়ে, ওর তো একটা লজ্জা সরম ভয় ভাবনা থাকা উচিত। এ ধরনের বদনাম রটা কি ভাল। আর যা ইচ্ছা করলে, একটু সাবধান হলেই, এড়িয়ে যাওয়া যায়। বিশেষ করে কলেজে, যেখানে পুরুষে মেয়েতে এক সঙ্গে পড়ে, সেখানে এক কাণ্ড। মুখ তো কেউ কারো চেপে রাখতে পারে না। তাই নানা জনে নানা কথা বলছে।
বললাম, 'মীরাকে ডেকে তুমি একটু বুঝিয়ে বল না। ও একটু সাবধান হোক।'
মা বললেন, 'ইশারা ইঙ্গিতে কি বলিনি? বেশী বলতে আমার লজ্জা করে বাপু! হাজার হলেও পেটের সন্তানের বয়সী।'
কিন্তু যাঁরা বলবার তাঁরা বিনা লজ্জা-সঙ্কোচেই বললেন। মীরাকে একদিন খবর দিয়ে নিয়ে গেলেন হিরণপ্রভা। তারপর প্রায় বিনা ভূমিকায় বললেন, 'তোমাকে এ কলেজের চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।'
মীরা বলল, 'কেন আমি কি দোষ করেছি।'
হিরণপ্রভা বললেন 'না তুমি দোষ করবে কেন, তুমি গুণের হাঁড়ি। এক মাসের মধ্যে তোমাকে কাজ ছেড়ে দিতে হবে।'
মীরা বলল, 'বেশ গভর্নিং বডি যদি বলেন—'
হিরণপ্রভা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গভর্নিং বডি বলুক আর না বলুক, আমি বলছি, সেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। বেশ, সেই বডিকে দিয়েই আমি বলাব।'

মীরা বলল, 'আচ্ছা ভেবে দেখি।'

শুভেন্দু, শুভ্রা, জয়ন্তী পাশের ঘরেই ছিল। তারাও এবার হিরণপ্রভার সঙ্গে যোগ দিল, 'এর মধ্যে ভাবাভাবির কিছু নেই। এক মাস নয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই কলেজ ছেড়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাকে। অত বড় একজন মানী গুণী মানুষ। তুমি তাঁর নামে বদনাম রটাচ্ছ।'

মীরা বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি বদনাম রটাচ্ছি!'

শুভেন্দু বলল, 'তোমাকে উপলক্ষ্য করেই তাঁর নাম বদনাম রটছে। এটা কিছুতেই আমরা সহ্য করব না।'

মীরা বলল, 'সহ্য করতে তো আমি বলিনে।'

শুভ্রা বলল, 'বটে! তুমি ভেবেছ আমরা তোমার বলা না বলার অপেক্ষায় থাকব। দাদা যা বলল, আর একটি সপ্তাহ আমরা দেখব। তারপর—'

মীরা নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। অন্য কলেজে চাকরির জন্যে ও নিজেই চেষ্টা করছিল। কিন্তু শুভেন্দুদের এই শাসানিতে মীরা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। ওরও জেদ বেড়ে গেল। দেখা যাক কি করতে পারে ওরা।

এক সপ্তাহ নয়, সাত আট সপ্তাহই কাটল। এর মধ্যে গরমের ছুটিতে হিরণপ্রভা সপরিবারে দার্জিলিং গেলেন। স্বামীকে ধরে নিয়ে গেলেন সেই সঙ্গে। কিন্তু সতীকান্ত সপ্তাহ দুই কাটতে না কাটতেই চলে এলেন। সেখানে স্ত্রীর কড়া পাহারা তাঁর সহ্য হল না। হিরণপ্রভা বৈষয়িক অবৈষয়িক স্বামীর নামের সব চিঠিগুলি আগে নিজে খুলে দেখতেন। তাঁকে না দেখিয়ে সতীকান্ত কোন চিঠি ডাকে দিতে পারতেন না। তিনি প্রতিবাদ করলে ছেলেমেয়ে পুত্রবধূর সামনে মীরার কথা তুলে স্বামীকে তিনি অপমান করতেন। সপ্তাহ দুই বাদে সতীকান্ত তাই পালিয়ে এলেন।

কিন্তু পরদিনের গাড়িতে হিরণপ্রভা এসে উপস্থিত হলেন। স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'বিরহ আর সহ্য হচ্ছিল না, না? তোমার বিরহ আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও।'

নিজের লাইব্রেরি-ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন সতীকান্ত। বাইরে থেকে তালাচাবি পড়ল। হিরণপ্রভা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'ওই ঘরে তার গায়ের গন্ধ আছে। বসে বসে শুঁকতে থাক।'

সতীকান্ত চেঁচিয়ে বললেন, 'আমার কলেজ খুলে গেছে যে, আমাকে কলেজে যেতে হবে না ?'

হিরণপ্রভা বললেন, 'তাকে আগে কলেজ ছাড়াই, তারপর তোমাকে সেখানে পাঠাব।'

সতীকান্ত ভেবে পেলেন না তাঁর হাতে মুঠি এমন আলগা হয়ে গেল কি করে। কি করে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা এমন ভাবে হস্তান্তরিত হল। ছেলেমেয়ে, চাকরবাকর, বেয়ারা-দারোয়ান কেউ তাঁর পক্ষে নয়। সব হিরণপ্রভার। আর তাঁর চরিত্র সংশোধনের ভার সকলের হাতে। গভর্নিং বডিকে হাত করলেন হিরণপ্রভা। তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিলে কলেজের দুর্নাম বেড়ে যাবে। প্রথমে মীরাকে পদত্যাগ করার জন্যে অনুরোধ করা হল। কিন্তু সে যে কর্তৃপক্ষের অনুরোধ রাখবে তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তাকে বরখাস্ত করলেন। আর এখবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সতীকান্তও রেজিগনেশন লেটার পাঠালেন। বললেন, শাস্তি একা কেন ভোগ করবে মীরা। তা তাঁরও প্রাপ্য। কর্তৃপক্ষ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করলেন না। কিন্তু সতীকান্ত এরপর থেকে আর কলেজে গেলেন না।

তাঁর এই ব্যবহারে তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সতীকান্তকে কলেজে পাঠাবার জন্যে নানারকম চাপ দেওয়া হল। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত বদলালেন না।

হাটে বাজারে শহরের প্রতিটি চায়ের দোকানে, বার-লাইব্রেরিতে এই একটি মাত্র আলোচনা ক'দিন ধ'রে চলতে লাগল, দুষ্টু ছেলেরা ছড়া কাটল, দেয়ালে দেয়ালে প্লাকার্ড পড়ল।

তারপর একদিন ভোরে উঠে শুনলাম, মীরাও নেই, সতীকান্তও নেই। দুইজনেই শহর ছেড়ে চলে গেছেন।

প্রথমে তাঁরা কলকাতাতেই ছিলেন। কিন্তু হিরণপ্রভা ছেলে আর জামাইকে সঙ্গে করে সেখানেও গেলেন। ফলে কলকাতা থেকেও পালালেন সতীকান্ত।

এরপর বছরখানেক বাদে মার সঙ্গে এই নিয়ে আমার আলাপ হয়েছিল। পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়েছি। শুনলাম কলেজে নতুন প্রিন্সিপ্যাল এসেছেন ডক্টর চৌধুরী। সতীকান্তবাবুদের সেই হৈ চৈ এরই মধ্যে শান্ত হয়ে গেছে। মীরার ভাই সুধীর বিয়ে করে সংসারী হয়েছে।
কথায় কথায় মা বললেন, 'মেয়েটা খারাপ ঠিকই। কিন্তু যত খারাপ সবাই বলত তত খারাপ নয়।'
বললাম, 'কি রকম।'
মা বললেন, 'লোকে তো বলত মেয়েটা টাকার লোভেই— সতীকান্তবাবুর ধন সম্পত্তির লোভেই অমন একজন বুড়োকে—'
হেসে বললাম 'তা যে নয় তা কি করে জানা গেল।'
মা বললেন, 'সতীকান্তবাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হিরণপ্রভা আর শুভেন্দুর নামে লিখে দিয়ে গেছেন। কিছু টাকা কলেজেও দিয়েছেন শুনলাম।'
আমি একটুকাল চুপ করে থেকে বললাম, 'মা আমার উপনিষদের সেই কাত্যায়নী আর মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান মনে পড়ছে। কাত্যায়নী রইলেন ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধন সম্পদ নিয়ে। আর মৈত্রেয়ী বললেন যেনাৎ নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।'
যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই স্ত্রীর গল্পটা মার জানা ছিল। তিনি বললেন, 'কাত্যায়নী কে? হিরণপ্রভা?'
বললাম, 'তা ছাড়া আবার কে?'
মা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'না বাপু, তা না। মানুষকে অমন সরাসরিভাবে ভাগ কোরো না। প্রত্যেকের মধ্যেই একজন করে কাত্যায়নী আছে, আর একজন করে মৈত্রেয়ী। সেদিন হিরণদির অসুখের খবর শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। কিসের

অসুখ? ডাক্তার বৈদ্য কি সে অসুখ ধরতে পারে? পারি আমরা। মেয়ে মানুষের সে অসুখ আমরা মেয়েমানুষেই বুঝি। হিরণদির সেই শরীর নেই, সেই রূপ নেই, যেন শুকিয়ে গেছেন। আমাকে দেখে তাঁর সে কি কান্না। সবই আছে। কিন্তু একের বিহনে সব অন্ধকার।' বলতে বলতে মায়ের চোখ দুটি ছল ছল ক'রে উঠল। হিরণপ্রভার সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের বন্ধুত্ব।

একটু থেমে বললেন—'আর ছেলেমেয়ে দুটির দিকেই কি তাকান যায়। তারা উপরে যত শক্ত ভাবই দেখাক, ভিতরটা তাদের পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে না? তাদের দুঃখ তাদের লজ্জাটা একবার ভেবে দেখ দেখি। অতবড় মানী-গুণী বাপ। তিনি আজ থাকতেও নেই। তাদের সামনে বাপের কথা কেউ তুললে এমন ভাব হয় তাদের—।'

তারপর প্রায় বছর দশেক মীরার সঙ্গে আমাদের কারোরই কোন যোগাযোগ ছিল না। শুনেছি ওরা ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে, নানা কলেজে চাকরি করেছে। মাঝে মাঝে দু' একবার কলকাতায়ও যে বেড়াতে না এসেছে তা নয়। কিন্তু পরিচিত কারো সঙ্গেই দেখা করেনি।

কিন্তু এবার গরমের ছুটির মধ্যে হঠাৎ ওর একটা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমি সম্প্রতি যে সব প্রবন্ধ লিখেছি সেগুলি ওর নাকি খুব ভালো লেগেছে। ওরা এখন নাগপুরে স্থায়ী-ভাবে আছে। যদি কোন দিন আমি ওদিকে বেড়াতে যাই যেন দেখা-সাক্ষাৎ করি। তাহলে ওরা দুজনেই খুব খুশি হবে।

ছুটিতে কোথায় যাই কোথায় যাই ভাবছিলাম। মীরার চিঠি পেয়ে ঠিক করলাম নাগপুরেই যাব; যদিও গরমটা ওখানে বেশি, তা হোক।

প্রথমে এক মারাঠা বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলাম। সেখান থেকে দেখা করতে গেলাম মীরার সঙ্গে।

শহরতলির অপেক্ষাকৃত একটু নিরালা জন-বিরল অঞ্চল ওরা বসবাসের

জন্যে বেছে নিয়েছে। বাংলো প্যাটার্নের পাটকিলে রঙের ছোট একটু বাড়ি। খানতিনেক ঘর। সামনে লম্বা বারান্দা। সেখান থেকে পাহাড়ের সারি চোখে পড়ে। বারান্দার নীচে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে মীরা ফুলের চাষ করেছে।

আমাকে দেখে মীরা খুবই খুশি হয়ে উঠল। বলল, 'তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আসবে আশাই করিনি। বহুকাল চেনা পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয় না।'

সতীকান্তবাবুর বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করতে পারলাম না। তিনি আগের মতই গম্ভীর আর রাশভারী রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'ভালো আছ?'

আমি প্রণাম করে বললাম, 'হ্যাঁ, ভালোই আছি। আপনি?'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'ভালো।'

কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য তেমন ভালো দেখলাম না। মীরার কাছে শুনলাম ব্লাড প্রেশারে খুব ভুগছেন। আর দেখলাম সতীকান্তবাবু অত্যন্ত বুড়ো হয়ে গেছেন। সব চুল পাকা। দাঁতও বেশির ভাগই পড়ে গেছে। শরীরের সেই বাঁধুনি আর নেই। কি জানি, রোগই হয়ত তাঁকে এমন অশক্ত করে তুলেছে।

সেই তুলনায় মীরার বয়স বেশি বেড়েছে বলে মনে হয় না। সে যেন তিরিশের নিচেই রয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই মীরা খুব কর্মঠ। তার সেই তৎপরতা যেন আরো বেড়েছে! সকালে কলেজে পড়ায়। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে তার বেশির ভাগ সময় সতীকান্তবাবুর সেবা-শুশ্রূষায় কাটে। তিনিও ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তবে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখন ছুটি নিয়েছেন।

মীরা আমাকে কিছুতেই মারাঠী বন্ধুর ওখানে ফিরে যেতে দিল না, বলল, 'তুমি আমার চিঠি পেয়ে এসেছ, আমাদের এখানেই থাকবে।'

বললাম, 'কোন অসুবিধে হবে না তো?'

মীরা হেসে বললে, 'অসুবিধে কিসের?'

দিন পনের ছিলাম ওদের সঙ্গে। ঘরে আসবাবপত্র সামান্য। দুখানা

তক্তপোষ। খান দুইতিন সস্তা ইজিচেয়ার। দু'খানা লিখবার ছোট টেবিল। সামনে দু'খানা হাতলহীন চেয়ার। আর লম্বা লম্বা বইয়ের র‍্যাক। সতীকান্ত তার সেই আগের লাইব্রেরির একখানা বইও নিয়ে আসতে পারেননি, কি আনেননি। কিন্তু এখানে ছোট-খাট আর একটি লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে।

খাওয়া দাওয়াও খুব অনাড়ম্বর। ডাল ভাত আর একটা তরকারি সতীকান্তের জন্যে আধসেরখানেক দুধ। আমার জন্যে মীরা বিশেষ ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল; আমি বাধা দিলাম।

একদিন বললাম, 'মীরা, এত কষ্ট করে আছ কেন? তোমার রোজগার তো খুব খারাপ নয়।'

মীরা বলল, 'পরের সম্পত্তি সবাই বড় দেখে।'

একটু বাদে ফের বলল, 'বেশি কিছু থাকে না পরিমল। ছোট ভাইবোনদের কিছু কিছু করে পাঠাতে হয়, ওরা তো এখনো সবাই যোগ্য হয়ে ওঠেনি। সুধীর একা পেরে ওঠে না।'

বললাম, 'তুমি গরীবের মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই তোমার না হয় এ সবে অভ্যেস আছে। কিন্তু ওর কষ্ট হয় না?'

মীরা বলল, 'না ওঁর ইচ্ছেমত এই ব্যবস্থা হয়েছে।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কিন্তু এত কৃচ্ছ্র কি ভাল মনে কর, সবাই যদি তোমার মত হয় জাতির ঐহিক সম্পদ বাড়বে কি ক'রে?'

মীরা হেসে বলল, 'সবাই আমার মত হবে কেন? তোমাকে বললাম তো এর চেয়ে বেশি ভাল অবস্থায় থাকবার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু যতই বল মানুষের মনের উপর বস্তুর প্রাধান্যতে কিছুতেই সায় দিতে পারিনে। সম্পদ সৃষ্টির নামে মানুষ একান্তভাবে বস্তুনির্ভর, বস্তুসর্বস্ব হবে—আর তাই যে সবচেয়ে ভাল একথা কি ক'রে মানি। তোমার ইদানীংকার প্রবন্ধগুলিতেও এই তর্ক তুলেছ। তাই তোমাকে ডাকলাম।'

একদিন বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরলাম। অনেকখানি পাহাড়ী পথ পার হওয়ার পর ছোট একটি ঝরণা মিলল।

বললাম, 'এসো এখানে একটু বসা যাক।'
খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম। ভারি নিস্তব্ধ নির্জন জায়গা। আমাদের চারদিকে পাহাড়ের বলয়, যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে।
বললাম, 'মীরা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'
মীরা আমার দিকে স্মিতমুখে তাকাল, 'করনা।'
বললাম, 'তুমি এমন কাজ করতে পারলে কি করে।'
মীরা হাসল, 'তোমার এতদিন বাদে এ কথা?'
'এতদিন বাদে না, আমার অনেক দিনই একথা মনে হয়েছে। তুমি কি ভালোবাসার আর মানুষ পেলে না?'
মীরা হেসে বলল, 'মানুষ অবশ্য হাতের কাছে আরো দু' একজন ছিল।'
বললাম, 'ঠাট্টা রাখ। অমন একজন বুড়ো, তোমার সঙ্গে বয়সের যাঁর অত তফাৎ, যাঁর স্ত্রী-পুত্র নাতি-নাতনী সব ছিল—। আমার একেক সময় মনে হয় বাইরের লোকের উৎপাতে তুমি বাধ্য হয়ে পালিয়ে এসেছ।'
মীরা স্মিতমুখে বলল, 'তাই যদি হবে, তাহলে একাই পালাতাম, ওর সঙ্গে আসতাম না।'
বললাম, 'তুমি তাহলে ভালোবেসেই এসেছ?'
মীরা কোন জবাব দিল না।
বললাম, 'কিন্তু একি এক ধরনের বিকৃতি নয়, ব্যভিচার নয়, অন্যায় নয়?'
মীরা এই তিরস্কারের এবারও কোন জবাব দিল না। তেমনি হেসে চুপ করে রইল।
মায়ের কথাগুলি আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'তুমি একজন পারিবারিক মানুষকে তাঁর পরিবার থেকে ছিনিয়ে এনেছ। তুমি একটি পরিবারকে অনাথ করেছ।'
মীরা এবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। অনুত্তেজ শান্ত সুরে বলল, 'ওকথা বলো না। তাঁর পারিবারিক বাঁধন ভিতরে ভিতরে

অনেক দিন আগে থেকেই খুলে গিয়েছিল। চলে আসবার দিন শেষ রাত্রে তিনি যেভাবে আমার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তুমি যদি তাঁর সে মূর্তি দেখতে তাহলে আজ অন্য কথা বলতে। আমি তাঁর ডাকে চমকে উঠে জানলার কাছে দাঁড়ালাম। প্রথমে মনে হল যেন ভূত। তারপরে দেখলাম ভূত নয় জেল থেকে পালিয়ে আসা কয়েদী। তেমনি বেশ বাস, তেমনি মুখ চোখ। তিনি বললেন,—মীরা, আমাকে মুক্তি দাও। আমি বুঝতে পারলাম এ-শুধু পরিবারের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি নয়, কামনার পীড়ন থেকেও মুক্তি। এঁকে মুক্তি দিতে হলে আগে বাঁধতে হবে।'

মীরা একটু থামল।

আমি বললাম, 'তারপর?'

মীরা বলল, 'তার আগের কথা একটু শুনে নাও। তার আগে এই কয়েক বছর ধরে কতবার তিনি আমার কাছে গেছেন, কত ছলে আমাকে কাছে ডেকেছেন; আর কত চেষ্টায় আসল বলবার কথাটাকে ঢেকে রেখেছেন। চেষ্টা করেছেন যাতে না বলে পারা যায়। নিজের সঙ্গে তাঁর নিজের সেই দুঃসাধ্য সংগ্রাম আমি তো না দেখেছি, এমন নয়। তবু শেষ মুহূর্তে তাঁকে বলতেই হল! প্রথমে একটা তীব্র ঘৃণা হল আমার, তারপর এক গভীর মায়ায় আমার সমস্ত মন ভরে গেল। ভাবলাম এই আর্তকে আমার আশ্রয় দিতে হবে। যে বটগাছ ভেঙে পড়ল, তাকে আমার তুলে ধরা চাই। আজ আমার দক্ষিণা দেওয়ার দিন এসেছে।'

আমি বললাম, 'শুধু দক্ষিণা, শুধু দাক্ষিণ্য?'

আমার কথা বোধ হয় মীরার কানে গেল না। কি ইচ্ছে করেই সে কানে তুলল না। মীরা আগের কথার জের টেনেই বলে চলল, 'তুমি বলছিলে পরিমল, আমি কি ভালোবাসার আর মানুষ পেলাম না? পাওয়ার অবসর পেলাম কই। প্রথম থেকেই এক প্রবল প্রচণ্ড ভালোবাসাকে ঠেকাতে ঠেকাতে—'

আমি বাধা দিয়ে হেসে বললাম, 'এই বুঝি তোমার ঠেকাবার নমুনা?'

মীরা আমার দিকে তাকাল 'তুমি কি ভেবেছ শুধু দু'হাত দিয়েই ঠেকান যায়, আর কিছু দিয়ে ঠেকান যায় না?'

বললাম, 'তাহলে তুমি তাকে ঠকিয়েছ বলো।'

মীরা একটু হাসল, 'এবার বুঝি উতোর গাইতে শুরু করলে? ছিঃ ঠকাব কেন। আমার যা সাধ্য আমি দিয়েছি তিনিও তা প্রসন্ন মনে নিয়েছেন। তাছাড়া একসঙ্গে থাকতে থাকতে কত অদলবদল হয়, কত নতুন সম্বন্ধ গড়ে ওঠে—'

এরপর সতীকান্তবাবুর কথা উঠল। বললাম, 'ওঁর রোগটা কি? তোমার এত সেবাযত্নেও উনি সারছেন না কেন? তাছাড়া বড় তাড়াতাড়ি যেন বুড়িয়ে পড়েছেন। তরুণী ভার্যা তো মানুষকে আরো তরুণ করে তোলে।'

মীরা লজ্জা পেয়ে বলল, 'তুমি বড় দুষ্টু। হয়ত ততখানি তারুণ্য আমার মধ্যে নেই, যাতে জরাকে জয় করা যায়।'

একটু বাদে মীরা ফের কথা বলল। তার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া, মুখের কথায় বিষণ্ণতার স্বর।

মীরা বলল, 'তুমি ঠিকই ধরেছ। ওঁর অসুখ শুধু দেহের নয়। উনি আজকাল বড় বেশী ভাবেন।'

'কি ভাবেন? যাদের ছেড়ে এসেছেন তাদের কথা কি ওঁর মনে হয়?'

মীরা বলল, 'মনে হয় বই কি। সরাসরি চিঠিপত্র লিখতে পারেন না, তাঁরাও কেউ লেখেন না। তবু অন্যভাবে তাঁদের খোঁজখবর আনান। তার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকেন। দেখ বাইরে থেকে এক কথায় একদিনে সব ছেড়ে আসা যায়। কিন্তু ভিতর থেকে ছাড়তে হয় প্রতিদিনের চেষ্টায়।'

'তোমার হিংসে হয় না?'

মীরা একটু হেসে বলল, 'হয় বই কি। তবে হিংসেয় একেবারে ফেটে মরিনে। কারণ তিনি শুধু তাঁদের জন্যেই ভাবেন না, আমার জন্যেও ভাবেন।'

'তোমার জন্যে আবার কি ভাবনা?'

মীরা বলল, 'ভাবনা নেই? ভাবেন, আমাকে কতটুকু দিয়ে যেতে পারলেন। শুধু বিদ্যার সাধনায় কি মানুষের সব সাধ মেটে? মেয়েদের সব সাধ মেটে?'
মীরা চোখ নামাল।
একটু বাদে আমি বললাম, 'তুমি কি তাহলে সুখী হওনি?'
মীরা এবার ফের মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, তাকিয়ে হেসে বলল, 'আশ্চর্য, এতক্ষণ আলাপের পর তোমার কি এই মনে হচ্ছে, আমি সুখী হইনি, আমি দুঃখে আছি?' কথা শেষ ক'রে মীরা আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইল।
আর তার সেই হাসি দেখতে দেখতে আমার নতুন করে মনে হল, সুখের আর এক অর্থ দুঃখ বহনের শক্তি।

তুয়ার কাছে সেদিন দেখা হয়ে গেল পুরোন সহপাঠী বন্ধু যতীশ দত্তের সঙ্গে। সেও আমাকে দেখে থেমে দাঁড়াল, বলল, 'আরে কল্যাণ তুমিও যে এদিকে।'

বললাম, 'এই হরতকীবাগান লেনের একটা প্রেসে এসেছিলাম। সে থাকগে কিন্তু তোমার বয়স কি করছে না বাড়ছে ?'

যতীশ হেসে বলল, 'কেন বলতো।'

বললাম, 'এই দশ বছরের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। ঠিক পঁচিশ বছরের সেই ছিমছাম যুবকটি রয়ে গেছ।'

যতীশ খুসী হয়ে আমার কাঁধে হাত রাখল, 'ঠিক তা নয়। অনেক বদলেছি হে। এর মধ্যে কত রকমের কত পরিবর্তন হোলো। বিয়ে বা ছেলেপুলে—হিসেব দিতে বললে একটা লম্বা ফিরিস্তি হয়ে যায়। তবে আমাদের পরিবর্তনটা তো ঠিক মেয়েদের পরিবর্তনের মত নয়। আমাদের রূপান্তর ওদের মত অমন বেশে বাসে ধরা পড়ে না।'

সামনের একটা রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে উঠলাম। বন্ধু চা সিগারেটে আমাকে আপ্যায়িত করল।

বললাম, 'কথায় কথায় মেয়েদের তুলনা টেনে আনার অভ্যাসটিও তোমার সেই আগের মতই আছে দেখছি।'

যতীশ স্বীকার ক'রে বলল, 'তা আছে মেয়েদের সম্বন্ধে কৌতূহল যেদিন যাবে সে দিন তো একেবারে মরে যাব হে। বয়স হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে গিন্নীটিও ভারি কড়া। বাইরের অন্য কোন মেয়ের কাছে ঘেঁষতে আর বড় একটা সাহস পাইনে। এখন শুধু চোখ দিয়ে দেখি, আর মুখে তাদের রূপগুণ কীর্তন করি।'

একটু বেশি জোরে কথা বলে যতীশ। আশপাশের টেবিলের ভদ্রলোকেরা আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কখন কি বেফাঁস বলে

ফেলে। ওকে নিয়ে বেশিক্ষণ এখানে বসে থাকা নিরাপদ নয়। তাই বেরিয়ে পার্কের একটা বেঞ্চে এসে বসলাম।

রাত প্রায় আটটা বাজে। বায়ুসেবীদের ভিড় অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে। বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে আলোর প্রতিবিম্ব। পুরোন বন্ধুকে পাশে রেখে কর্মব্যস্ত জীবনের এমন কয়েকটি থেমে থাকা মুহূর্তের স্বাদ মাঝে মাঝে বেশ নতুন লাগে।

এক সময় বন্ধুকে বললাম, 'হ্যাঁ, মেয়েদের বেশবাস আর রূপান্তরের কথা কি বলছিলে।'

যতীশ হেসে বলল, 'খুব সাধুপুরুষ! কথাটি বুঝি তোমার মাথার মধ্যে এখনো ঘুরছে। আমাদের অফিসের অঞ্জলির কথা বলছিলাম। তুমিতো দশ বছরের মধ্যে আমার কোন পরিবর্তনই দেখলেনা, আর আমি এই চার পাঁচ বছরে তার কতরূপ কত রূপান্তরই না দেখলাম।'

কৌতূহল প্রকাশ ক'রে বললাম, 'ব্যাপারটা কি।'

যতীশ হেসে বলল, 'ভারি গরজ যে। তথন জমকালো কোন গল্প নেই। তোমার কোন পূজো সংখ্যার কাজে লাগাতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ আমি শুধু চোখে দেখা কয়েকটি ছবির কথা বলব, গল্প বলব না।'

আমি অধীর হয়ে বললাম, 'আচ্ছা বলহে বল, যা দেখেছ তাই বলে যাও, গৌরচন্দ্রিকা আর বাড়িয়ো না।'

ধমক খেয়ে যতীশ এবার স্বরু করল, 'আমাদের ম্যাঙ্গো লেনের পাবলিসিটি ব্যুরোর ছোট্ট অফিসটায় তুমি তো আর বছর পাঁচ ছয়ের মধ্যে যাওনি। যাবে কেন, বড় বড় অফিসের সঙ্গে তোমার আজকাল দহরম, মহরম। কিন্তু দয়া করে যদি আমাদের গরীবদের সেই ছোট অফিসটায় মাঝে মাঝে যেতে ছবিগুলি তোমারও চোখে পড়ত। মনে আছে বোধ হয় পাটকেলে রঙের ফ্ল্যাটবাড়িটার দোতলায় পশ্চিম দিকের দেড় খানা ঘর নিয়ে আমাদের সেই অফিস। আধখানায় থাকেন আমাদের মনিব রামশঙ্কর রায়। একাধারে

তিনিই কোম্পানীর সেক্রেটারী, ম্যানেজার আর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। আর বড় ঘরটায় বসি আমরা পাঁচজন কেরাণী। দু'জন বিজ্ঞাপনের কপি লিখি একজন স্কেচ আঁকি, একজন টাকা আনা পাইয়ের হিসাব মেলাই, আর একজন চিঠিপত্র টাইপ করি, বড়বাবুর ডিকটেশান নিই। পাঁচ বছর আগে এই শেষের কাজটা ছিল সতীশ সমাদ্দারের। মোটা সোটা নাদুস নুদুস চেহারা। বড়বাবুর ঘরে থেকে ডাক এলে সে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ত। চার পাঁচখানা চেয়ার টেবিলে ডিঙ্গিয়ে কাঠের পার্টিসনের ওধারে বড়বাবুর ঘরে যেতে তার বড় কষ্ট হোতো। তার মেদবাহুল্যের দিকে তাকিয়ে আমরা হাসতাম। বলতাম, 'কি খেয়ে এত মোটা হচ্ছ হে সতীশ। উপুরি টুপুরি মিলছে না কি কিছু ?'

যাহোক কিছুদিন বাদে তার কষ্টের অবসান হোলো। ক্লাইভ রোয়ের বড় বড় হলওয়ালা এক অফিসে সে চান্স পেয়ে চলে গেল। তার জায়গায় এসে বসল একটি রোগা ছিপ ছিপে মেয়ে। অঞ্জলি! অঞ্জলি সেন। আমাদের রামশঙ্কর বাবুরই নাকি ছেলে বেলার কোন এক মাষ্টার মশাইর মেয়ে। আই এ পর্যন্ত পড়েছে। কলেজ ষ্ট্রীটের কোন একটা কর্মাশিয়েল স্কুল থেকে ছ'মাসের কোর্সে টাইপরাইটিং শিখেছে। মাষ্টার মশাই নাকি তাঁর পুরোন ছাত্রের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলেন মেয়ের জন্যে এই চাকরীটুকু জোগাড় করতে।

যাই হোক, অঞ্জলি এসে বসল আমাদের সামনের টেবিলে, পশ্চিমের জানালার দিকে পিঠ দিয়ে। আমরা ওর দিকে তাকাই না। যে যার কাজ কর্ম নিয়ে থাকি। তবু চার জোড়া চোখের কোন না কোন একটি জোড়া ওর ওপর গিয়ে পড়ে। চোখাচোখি হবার ভয়ে অঞ্জলি প্রায় সব সময় মাথা নীচু করেই থাকে। ওদিকে তাকালেই সবচেয়ে চোখে পড়ে ওর কালো চুলের মাঝখানে সরু একটি সাদা সিঁথি; পরণে সস্তাদামের একখানি ফিকে সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ী। তা গায়ের রঙ ফর্সা থাকায় মন্দ মানায়নি। গলায় এক চিলতে সরু হার, হাতে এক গাছি ক'রে লাল রঙের প্ল্যাষ্টিকের চুড়ি। আর কোথাও কোন আভরণ নেই। পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়া জীর্ণ।

অঞ্জলির আপাদমস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ওর বাড়ী-ঘর আত্মীয়-স্বজনের অবস্থাটা দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যায়। তার জন্যে আন্দাজ অনুমানের দরকার হয় না।

অঞ্জলির টাইপ রাইটারে খটাখট্ শব্দ হয়। ওর মুখে কোন শব্দ নেই। চুপচাপ কাজ ক'রে যায়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বড়বাবুর ডাক পড়লে চেয়ার ছেড়ে তড়াক ক'রে উঠে একেবারে হরিণীর মত ছুটে যায়।

আমার পাশের পরেশ বাঁড়ুজ্যে আমার গা টিপে দিয়ে বলে, 'দেখেছ প্রভুভক্তি। এ মেয়ে চাকরিতে উন্নতি করতে পারবে।'

আর্টিষ্ট স্থরেন সিং এখনো বিয়ে থা করে নি' ওর বয়সও পঁচিশ ছাব্বিশের মধ্যে। প্রভুর ওপর হিংসেটা তারই একটু বেশি। 'ওঘরে অতই যদি ঘন ঘন দরকার তাহ'লে চেয়ার খানা একেবারে স্থায়ীভাবে ওখানে নিয়ে পাতলেই হয়।'

কপি লিখতে লিখতে পরেশ বাঁড়ুয্যে জবাব দেয়, 'আরে ভাই, একটু আড়াল না রাখলে কি চলে। তা ছাড়া লক্ষ্মীর আসন পেচকদের পিঠে, শুধু সিংহাসন নারায়ণের গোলকে।'

অঞ্জলির বয়স একুশ বাইশের বেশি নয়, আর রামশঙ্করবাবু চল্লিশের ওপরে। বিবাহিত! চার পাঁচটি ছেলেমেয়েও হয়েছে। তবু তাঁর সঙ্গে অঞ্জলির নাম জড়িয়ে আমরা ওর অসাক্ষাতে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা করি। কিন্তু ওর সেই মাথা নীচু করা মূর্তিটির দিকে যখন আমরা তাকাই, আমাদের মুখে আর কথা সরে না। নিজেদের বাচালতায় আমরা নিজেরাই লজ্জা পাই।

মাইনে পেয়ে আমরা কেউ নতুন গেঞ্জি কিনেছি, কারো বা জুতো কেনবার সামর্থ্যও হয়েছে। কিন্তু ওর পারিবারিক চাপ কি এতই বেশি যে সেই পুরোণ শাড়ী আর ছেঁড়া স্যাণ্ডেল জোড়াও বদলাতে পারল না।

ক্রমে আমাদের সঙ্গে ওর আলাপ পরিচয় হোলো।

এক সঙ্গে কাজ করতে করতে যেমন হয় তেমনি। পরেশ একদিন

বলল, 'আপনার কোন অসুবিধে হলে বলবেন। একটুও লজ্জা করবেন না।'

অঞ্জলি আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'লজ্জার কি আছে। আপনারা আমার দাদার মত। আপনারা আমাকে আপনি আপনি বলেন তাতেই বরং লজ্জা পাই। আপনারা আমার নাম ধরে ডাকবেন, তুমি বলবেন।'

আমরা সবাই থ'। এক সঙ্গে এত কথা অঞ্জলি এর আগে বলেনি। টিফিনের সময় বাথরুমের সামনে পরেশের সঙ্গে দেখা, হেসে বললাম, 'আরে ভাবনা কি, তুমি বলবাব অনুমতি তো পেয়েই গেলে।'

পরেশ বলল, 'আরে দূর। অমন একতরফা তুমি বলায় কি কোন সুখ আছে? আমি যাকে তুমি বলি, তাকে তুমি বলাই।'

বললাম, 'কিন্তু এখানে তেমন দোতরফার সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না। বড় শক্ত ঠাঁই।'

পরেশ বলল, 'তুমি দেখি আহ্লাদে ডগমগ হয়ে উঠেছ। আর তোমাকে তো বাদ দিয়ে বলেনি, তোমাকেও দাদা বলেছে।'

বললাম, 'বলুক ভাই, বলুক। তরুণী মেয়েদের মুখে এখনো যে কাকুবাবু, মামাবাবু শুনতে হচ্ছে না এতেই আমি খুসি।'

এ্যাকাউনট্যাণ্ট শশাঙ্ক সরকারের লক্ষ্য টাকা আনা পাইয়ের দিকে। মাথায় টাক পড়েছে, পাঞ্জাবী উঁচু হয়ে উঠে নোয়াপাতি ভুঁড়ি দেখা দিয়েছে। পঞ্চাশের কাছাকাছি গেছে বয়স। অঞ্জলি তাকে দাদাই বলুক আর পিসেমশাই বলুক তার কিছুতে আপত্তি নেই। কোন বিলের কোন তহবিলের টাকা আগাম খরচ করে ফেললে বেশি জবাবদিহি করতে হবে না। শশাঙ্ক সেই হিসেব নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আমি, পরেশ আর সুরেন তো তার মত কাঞ্চনের ছোঁয়া পাইনি, তাই আমরা বে-হিসেবী কিছু করতে পারি আর না পারি, বোল-চালটা খুব ঝাড়ি।

বয়ঃকনিষ্ঠ সুরেনের বেলায় কিন্তু সম্বোধন পাল্টাল না। অঞ্জলি তাকে সুরেনবাবু বলে। সুরেনবাবু তাকে নাম ধরে ডাকে না, একটি সর্বনামে ডাকে, আপনি।

কথাবার্তার ধরণে মনে হয় সে-যেন অঞ্জলির সবচেয়ে আপন। এই পক্ষপাতটা স্বাভাবিক হলেও আমার আর পরেশের কাছে সুখকর মনে হয় না।

যাই হোক, তৃতীয় চতুর্থ মাসের মাইনে পাওয়ার পর অঞ্জলি চাঁপা রঙের একখানা নতুন শাড়ী কিনল, স্যাণ্ডেল জোড়াও পাল্‌টে নিল। আরো মাস কয়েক বাদে সে বেশ সুপ্রতিভ হয়ে উঠল। আজকাল বড়বাবু ডাকলে হরিণীর গতিতে ছোটে না, মরালের গতিতে চলে। আমাদের সঙ্গে হেসে একটু রসিকতাও করে। পরেশকে একদিন বলল, 'বউদি কেমন আছেন? কই একদিন তো যেতেও বললেন না, আলাপও করিয়ে দিলেন না তার সঙ্গে।'

বললাম, 'পরেশের সে সাহস নেই।'

অঞ্জলি বলল, 'কেন, এত ভয় কিসের পরেশদা।'

পরেশ বলল, 'ভয় যে কিসের তা তুমি বুঝবে না অঞ্জলি। তোমাকে যদি বাড়ীতে নিয়ে যাই, আর বলি তুমি আমাদের অফিসে কাজ কর, তাহলে এ অফিসে তোমার বউদি আর আমাকে আসতে দেবে না, গুষ্ঠিশুদ্ধ না খেয়ে মরলেও না।'

অঞ্জলি বলল, 'আপনাকে না আসতে দেওয়াই উচিত।'

বলে মুখ নীচু করে হাসতে লাগল।

আমরা তো অবাক। ও যে পরেশের ঠাট্টায় যোগ দেবে তা আশা করিনি। হোলো কি অঞ্জলির।

আরো দেখলাম চিঠিপত্র টাইপ করবার ফাঁকে ফাঁকে ও আজকাল অফিসে বসেই নভেল পড়ে। তোমাদের মত লেখকদেরই সব আধুনিক উপন্যাস। কি সব বস্তু তাতে থাকে তার নমুনা আমার জানা আছে। পরেশও জানে। নভেলের মধ্যে গোলাপী রঙের দু' একখানি টিকিট গোঁজা থাকে। পড়া আর অপড়া অংশের সীমানা। পরেশ আমাকে আড়ালে ডেকে বলে, 'সাহস দেখেছ মেয়েটার? অফিসে বসে নভেল পড়বার কথা আমরা কি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পেরেছি! যদি কেউ রিপোর্ট করে একটুও ভয় নেই।'

হেসে বললাম, 'ওর বিরুদ্ধে কে রিপোর্ট করবে বলো? তুমি নও

আমি নই, স্বরেন তো নয়ই, এমন কি শশাঙ্ক সরকারেরও সে প্রবৃত্তি হবে না ও তা জানে আর আমাদের বেয়ারা নিতাই ছোক্‌রার কাণ্ড দেখছো? আমরা কেউ বাইরে থেকে পান সিগারেট আনতে বললে ও কি রকম গজ গজ করে। আর অঞ্জলি কিছু বললে হাসতে হাসতে চলে যায়।'

পরেশ বলল, 'আরে ভাই, স্বন্দর মুখ শুধু চাকর বেয়ারা কেন, কুকুর বেড়ালও চেনে। আমার তো মনে হয় এ অফিসের টেবিল-চেয়ারগুলির পর্যন্ত অঞ্জলির ওপর পক্ষপাত আছে?'

পরেশ একদিন স্বরেনকে সরাসরি চার্জ করে বলল, 'ওহে ছোক্‌রা, অঞ্জলির হাতে ওসব অশ্লীল নভেল কে এনে দেয়? নিশ্চয়ই তুমি।'

স্বরেন তুলি রেখে জোড় হাত করে বলল, 'না দাদা। আমার সে সৌভাগ্য হয়নি। যদি হোত আপনার ঐ ধমক দেওয়া মুখে সন্দেশ গুঁজে দিতাম।'

আমাদের বিশ্বাস হয় না। স্বরেন ভারি চালাক। চেহারাটিও কালোর ওপর বেশ চোখা। ও ডুবে ডুবে জল খায় কিনা কে জানে।

আর একদিন আমাদের চোখে পড়ল অঞ্জলির বইয়ের মধ্যেই শুধু গোলাপী রঙের টিকিট গোঁজা নয়, ওর খোঁপার মধ্যেও একটি গোলাপ গোঁজা রয়েছে। তার রং একেবারে টকটকে লাল। হৃদয়ের রস না মিশলে গোলাপের অমন রঙ হয় না।

আমরা আবার গিয়ে চেপে ধরলাম স্বরেন সিংকে বললাম, 'স্বরেন, ও নিশ্চয়ই তোমার গোলাপ।'

স্বরেন বলল, 'না দাদা, আমার ভাগ্যে শুধু আপনাদের কথার কাঁটা। গোলাপ টোলাপ এই চার আঙুলের মধ্যে নেই।'

বলে কপালে হাত রাখল স্বরেন।

আমাদের চোখের দৃষ্টি ঠোঁটের হাসি অঞ্জলি লক্ষ্য করে থাকতো। ও এক ফাঁকে গোলাপটা খুলে নিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। বছর ঘুরে গেল। তারপর হঠাৎ দেখি একদিন আমাদের প্রত্যেকের

টেবিলের ওপর অঞ্জলি কখানা করে চিঠি রেখে দিচ্ছে। সে চিঠির রঙও গোলাপী। ওপরে শঙ্খ আঁকা।
বললাম, 'কি ব্যাপার।'
অঞ্জলি মৃদু হেসে চুপ করে রইল। একটু বাদে বলল, 'বাবা নিজে এসে বলতে পারলে না। বুড়ো মানুষ। আপনারা কিন্তু সবাই যাবেন। দয়া করে পায়ের ধূলো দেবেন।'
আমরা চিঠিখানা পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। না, সুরেন সিং নয়। কোন একজন বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে অঞ্জলির শুভ-পরিণয়টা হচ্ছে বাইশে আষাঢ় তেত্রিশ নং মলঙ্গা লেনে। আমাদের সবান্ধবে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ করেছেন অঞ্জলির বাবা বিনোদচন্দ্র সেন।
বললাম, 'বেশ সুখকর। আগে থেকেই একটু জানা শোনা ছিল নাকি অঞ্জলির? আমরা যেন তার আভাষ পাচ্ছিলাম।'
অঞ্জলি হেসে মুখ নীচু করে রইল। কোন জবাব দিল না।
ছুটি নেওয়ার দিন অনুরোধ করে গেল, 'যাবেন। যাবেন কিন্তু সুরেনবাবু।'
আমরা অঞ্জলির অনুরোধ রক্ষা করলাম। বিয়ের দিন সন্ধ্যার পর গিয়ে পেট পুরে লুচি, তরকারী, মিষ্টি, দই খেয়ে এলাম। উপহারও দিলাম এক একজন এক একখানা করে বই। বন্ধুকৃত্য করেছিলাম। পয়সা দিয়ে তোমার বই কিনে দিয়েছিলাম হে। ভিতরে কি আছে মোটেই কিছু আছে কিনা দেখিনি। তবে খুব রঙ চঙে মলাট। ঠিক একেবারে অঞ্জলির শাড়ীর রঙের মত।
খেয়ে দেয়ে চেলি পরা, চন্দনের ফোঁটা কাটা অঞ্জলির সঙ্গে আমরা দেখা করে এলাম। বিশ্বাসই হতে চায় না, আমাদের অফিসের সেই টাইপিষ্ট মেয়েটি। ওর বরকেও দূর থেকে দেখলাম। তা দেখতে টেকতে ভালোই। বেশ লম্বা টম্বা স্বাস্থ্যবান ছেলে। বয়স আমাদের সুরেনেরই মত। শোনলাম বি-এ, পাশ করেছে, চাকরী পেয়েছে কর্পোরেশনে।
ভাবলাম হয়ে গেল। আবার কোন সতীশ সমাদ্দার এসে বসবে

অঞ্জলির চেয়ারে কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে কোন লোক নেওয়া হোল না। শশাঙ্ক সরকারের ওপরেই হুকুম হোলো টাইপের কাজটা চালিয়ে নিতে। তারপর পনের দিন বাদে দেখি অঞ্জলি এসে হাজির। ও অফিস থেকে বিদায় নেয়নি, শুধু পনের দিনের ছুটি নিয়েছিল।

আমরা একটু অবাক হয়ে বললাম, 'একি ব্যাপার। শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে তুমি আমার এই অফিস বাড়ীতে কেন!'

অঞ্জলি হেসে বলল, 'এলাম। আপনাদের মায়া কাটানো সোজা নাকি।'

চেয়ে দেখলাম তার শুধু গোত্রান্তর হয়নি, একেবারে রূপান্তর ঘটেছে। ওর সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা কপালে ছোট একটা ফোটা, ঠোঁট দুটি রক্তাক্ত, লিপষ্টিকে নয়, পানের রসেই, কানে দুল, গলায় নতুন ডিজাইনের হার, হাতে চারগাছি করে চুড়ি সেই সঙ্গে সাদা সরু শাঁখাও আছে এক গাছি, রোজ না হলেও সপ্তাহে তিনবার ক'রে শাড়ী পালটায় অঞ্জলি, কোনদিন ফিকে হলদে, কোনদিন সবুজ, কোনদিন গাঢ় লালরঙের শাড়ী পরে আসে অঞ্জলি। স্যাণ্ডেলের বদলে হাইহীল জুতো কিনেছে, লতাপাতা আঁকা শান্তিনিকেতনী ভ্যানিটি ব্যাগ আনে হাতে ঝুলিয়ে, কোনদিন বা বগলে চেপে।

টাইপরাইটারের পিছনে একটি নরম মনোহর নতুন মূর্তি আমরা বসে বসে দেখি। রূপ যৌবনে এক পরিপূর্ণ নারী। সংসারে রহস্যরাজ্যের দুয়ার খুলে গেছে তার কাছে। রূপ রসের নতুন স্বাদ পেয়েছে। সেই আস্বাদনের আনন্দ আর পরিতৃপ্তি আমরা ওর চোখে মুখে দেখি। ওর চলায় বলায় হাসায় চাওয়ায় প্রত্যক্ষ করি।

পরেশ আর আমার মধ্যে এখনো মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। পরেশ বলে, 'দেখেছ রূপ? যাকে বলে ভাদ্রের ভরা নদী। জল একেবারে দুকূল ছাপিয়ে পড়েছে। আমাদের অফিস টফিস এবার ভেসে যাবে।'

আমি একটু লজ্জিত হয়ে বলি, 'আঃ কি হচ্ছে পরেশ। ও এখন পরস্ত্রী—।'

পরেশ আমাকে ধমক দিয়ে ওঠে, 'থাম থাম। পর ছাড়া ও আমাদের

আপন ছিল কবে। তখন ছিল পরকন্যা এখন পরস্ত্রী। কিন্তু চোখ দুটি তো আমার নিজের। বিয়ের ছ' মাস যেতে না যেতে কি রকম হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে দেখেছ! মেয়েরা বলে বিয়ের জল। জল নয়, জমাট জল। বেচারা স্বরেন।'

কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা ওর শ্বশুরবাড়ীর খোঁজ খবর নিই। শ্বশুর নেই, শাশুড়ী আছেন, ছোট ননদ একটি স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। মনোহর পুকুর রোডের দু'খানা রুমের একটি ফ্ল্যাটবাড়ীতে ওরা থাকে। স্বামী খুব সৌখীন।

পরেশ বিড়ি ধরিয়ে মন্তব্য করে, 'সৌখীন যে তা আমাদের বুঝতে বাকী নেই।'

অঞ্জলি লজ্জা পেয়ে চোখ নামায়। একটু বাদে মুখ তুলে নালিশের ভঙ্গিতে বলে, 'সত্যি পরেশদা, কি রকম মানুষ দেখুন। এত করে বলি আমি তো আর কারো বিয়ে অন্নপ্রাসনের নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি না, অফিসেই যাচ্ছি! তা কিছুতেই শুনবেনা। সাজসজ্জা নিজেও খুব ভালবাসে, আবার—'

বাকি কথাটুকু না সেরে হেসে চুপ ক'রে থাকে অঞ্জলি। পরেশ বলে, 'ভায়াকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ জানাই। তার বিবেচনা আছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বিয়ের পর চাকরী করতে দিতে তোমার শাশুড়ী আপত্তি করেন নি?'

অঞ্জলি বলল, 'একটু আধটু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে বুঝিয়ে বলায় শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন। আমিও খুব কাকুতি-মিনতি করছি। না ক'রে করব কি বলুন। বাবাকে এখনো কিছু কিছু সাহায্য করতে হয়। অনেকগুলি ভাইবোন—'

বছর ঘুরে এল। অঞ্জলি হঠাৎ একদিন বলল, 'আজ কি খাবেন বলুন।'

অবশ্য এর আগেও টিফিনের সময় আমাদের চা টোষ্ট খাইয়েছে অঞ্জলি। তবে এমন ঘটা ক'রে জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করেনি।

পরেশ বলল, 'ব্যাপার খানা কি। কোন উপলক্ষ্য টক্ষ্য আছে নাকি?

অঞ্জলি মুখ নীচু ক'রে বলল, 'না, 'উপলক্ষ্য আবার কিসের।'

আমি বললাম, 'পরেশ, ক্যালেণ্ডারটা ভাল ক'রে দেখ দেখি। আজ নিশ্চয়ই বাইশে আষাঢ়।'
অঞ্জলি হেসে বলল, 'যতীশদা আপনি কি ক'রে জানলেন?'
বললাম, 'ওসব দিন তো আমাদেরও গেছে।'
অঞ্জলি প্রতিবাদ করে বলল, 'মোটেই যায়নি। এখনো পুরোপুরি আছে। আপনাদের দিন কোনদিন যাবে না।'
পরেশ আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, 'শুধু জীবন থেকে রাতগুলি বাদ যাবে।'
সেদিন অঞ্জলির পয়সায় পেটভরে আমরা চা কাটলেট খেলাম।
পরেশ বাইরে এসে বলল, 'শুধু বিবাহবার্ষিকী নয় হে, আরো ব্যাপার আছে।'
বললাম, 'আর আবার কি ব্যাপার।'
পরেশ বলল, 'ওর ছেলেপুলে হবে।'
হেসে বললাম, 'তোমার চোখ কিছুই এড়ায় না।'
পরেশও হাসল, 'একি এড়াবার জিনিষ। দেখ গোপনে গোপনে পাড়ার মেয়ের প্রেমিক যখন আসে কেউ টের পায় কেউ পায় না। কিন্তু সন্তান আসে ঢাক ঢোল পেটাতে পেটাতে—।'
আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'থামো থামো।'
অঞ্জলির সন্তানের আবির্ভাবের আভাস মাসের পর মাস পরিস্ফূট হয়ে উঠতে লাগল। ওর হাঁটায় চলায় আবার একটা ধীর মন্থরতা এসেছে। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হলে ও আজকাল মুখ নামিয়ে নেয়। ভারি লজ্জায় অঞ্জলি। অথচ বিষয়টা গৌরবের! সেই গৌরবকে ও লুকিয়ে রাখতে পারে না, বোধহয় চায়ওনা। ওর সংকোচের ভিতর থেকে সেই অপূর্ব সুখ আর সমৃদ্ধি ফুটে বেরোয়। প্রথম মা হওয়ার সময় তরুণী মেয়ের যে রূপ সে রূপের তুলনা নেই। টাইপ করতে করতে মাঝে মাঝে হাঁই তোলে অঞ্জলি। টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমোয়।
পরেশ ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুখ মুচকি হাসে। শুধু হাসা নয় সে একদিন আর একটু বাড়াবাড়ি করে বসল। টিফিনের সময় নীল

রঙের ছোট একটি বার্লির কৌটা পকেট থেকে বার করে অঞ্জলির টাইপরাইটারের সামনে রাখল।

অঞ্জলি বলল, 'কি ব্যাপার। কৌটায় কি আছে পরেশদা।'

পরেশ বলল, 'খুলে দেখ তোমার বউদি পাঠিয়ে দিয়েছে।'

মুখ খুলে দেখা গেল ঠাসা এক কৌটা কুলের আচার। অঞ্জলির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বলল, 'ভারি দুষ্টু হয়েছেন আপনি। দাঁড়ান বউদির কাছে আমি যদি নালিশ না করি—'

স্ত্রীর নাম করে দিলেও আচারটা বৈঠকখানার বাজার থেকে পরেশ নিজেই কিনে এনেছিল।

অঞ্জলি বেরিয়ে গেলে স্থরেন আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছি ছি এসব কি কাণ্ড করেছেন আপনারা।'

পরেশ বলল, 'কাণ্ডের এখনই কি দেখলে স্থরেন। এই অফিসের মধ্যে ওর আমরা সাধ দেব। মিষ্টির খরচটা আমার আর শশাঙ্কর। শাড়ীখানা চাঁদা করে স্থরেন যতীশ কিনে দিয়ো। না কি স্থরেন একাই দেবে?'

বলে এক চোখে তাকালে পরেশ বাঁড়ুজ্যে।

স্থরেন লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

অঞ্জলির বিয়ের আগে ওর সঙ্গে স্থরেন আলাপ-টালাপ করেছে। মাঝে মাঝে দু'জনকে গল্পও করতে দেখেছি। চিঠির ঠিকানা টাইপ করানো কি এমনি দু' একটা টুকটাক কাজ অঞ্জলিকে দিয়ে করিয়ে নেওয়ার খুব উৎসাহ দেখতাম স্থরেনের। কিন্তু ওর বিয়ের পর থেকে স্থরেন ওসব ছেড়ে দিয়েছে। সে আজকাল তার কোণের টেবিলে তুলি, রঙের বাক্স আর ডিজাইন টিজাইন নিয়েই পড়ে থাকে। কথাবার্তা বেশি বলে না। পরেশ বলে, 'হিংসে হয়েছে ছোঁড়ার।' আমি বলি, 'দূর তা নয়। স্থরেন লজ্জা পেয়েছে। ওর বয়সে কোন সমবয়সী বিবাহিতা মেয়ের কাছে ঘেঁষতে অবিবাহিত ছেলের একটু স্বাভাবিক লজ্জা হয়।'

আমি লক্ষ্য করি অঞ্জলি মাঝে মাঝে স্থরেনকে একথা ওকথা জিজ্ঞেস করলে ও কি রকম আরক্ত হয়ে ওঠে। আগে ওর এমন সঙ্কোচ ছিল

না। অফিসের মধ্যে বিবাহিতা এমন কি অন্তসত্ত্বা মেয়ে থাকায় লজ্জা যেন সবচেয়ে স্থরেনেরই বেশি। ও অঞ্জলির দিকে তাকায় না। সে কিছু জিজ্ঞেস করলে মুখ নীচু করে জবাব দেয়।

ওর ভাব ভঙ্গী দেখে অঞ্জলিও হাসে। ওর অসাক্ষাতে মাঝে মাঝে মন্তব্য করে, 'স্থরেনবাবু ভারী লাজুক।'

আমি বলি, 'তোমার বিয়ের পর ওর লজ্জাটা বেড়েছে।'

অঞ্জলি এবার লজ্জিত হয়ে বলে, 'আহা, সবাই তো আর আপনাদের মত নয়।'

বলি, 'সবাই একরকম হবে কেন। কেউ মুখপোড়া কেউ মুখচোরা।'

আমাদের কথাবার্তায়, ইসারা-ইঙ্গিতে শালীনতার অভাব স্থরেন সহ্য করতে পারে না। প্রতিবাদ করে বলে, 'ছি ছি একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে কি করছেন আপনারা।'

পরেশ সংক্ষেপে মন্তব্য করে, 'আর কিছু করবার নেই।'

সাত মাসে সাধ দেওয়ার চক্রান্ত পরেশের সফল হোল না। তারা আগেই অঞ্জলি অফিসে আসা বন্ধ করল। এবারো ওর চেয়ারে নতুন লোক কেউ এল না। গোঁফওয়ালা শশাঙ্ক সরকারই গিয়ে নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে টাইপিষ্টের চেয়ারে গিয়ে বসতে লাগল। শুনলুম অঞ্জলি কাজ ছেড়ে দিয়ে যায়নি, শুধু তিন মাসের ছুটি নিয়েছে।

অঞ্জলি নেই। তবু তার নাম করে পরেশ ঠাট্টা করতে ছাড়তেন না। শশাঙ্ক সরকারকে বলে, 'তুমি যে ও চেয়ার ছেড়ে উঠতে চাও না শশাঙ্ক? ওখানে বসেও স্থখ না?'

কোনদিন বলে, 'দেখবো ড্রয়ারের মধ্যে চুলের কাঁটা টাটা কিছু রেখে গেছে নাকি?'

শশাঙ্কবাবু বিরক্ত হয়ে জবাব দেন, 'কাঁটা কেন তোমার জন্য প্রেম পত্তর রেখে গেছে। এসো, দেখবে এসো।'

তিনমাস নয় চারমাস পরে ফিরে এলো অঞ্জলি। কিন্তু একি বেশ। একি চেহারা। পরনে ধবধবে সাদা থান। সিঁথি সাদা। কান, গলা, হাত সব একেবারে শূন্য। অঞ্জলি সোজা গিয়ে বসল টাইপিষ্টের

চেয়ারে। খুলে ফেলল টাইপরাইটারের কালো ঢাকনাটা। ছোট মেসিনটির পিছনে একটি স্তব্ধ শান্তি শ্বেত পাথরের মূর্তি। একেক সময় মনে হয় নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ।

আমরা ভালো করে ওর দিকে তাকাতে পারিনি। কথা বলা তো দূরের কথা। বাচাল পরেশ একেবারে বোবা হয়ে গেছে।

দুপুরের পরে আমি এক সময় জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ দুর্ঘটনা কবে ঘটলো অঞ্জলি? আমরা তা কিছুই জানতে পারিনি।'

অঞ্জলি বলল, 'রামশঙ্করবাবুকে জানিয়েছিলাম। একমাস হোলো—'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছিল?'

'ম্যালিগনাণ্ট ম্যালেরিয়া?'

একটু বাদে বললাম, 'তোমার তো ছেলে হয়েছে শুনেছি। কেমন আছে সে?'

অঞ্জলি উদাসীন নিস্পৃহভাবে বলল, 'সে আছে।'

তারপর রামশঙ্কর বাবুর লেখা কাটা-কুটি করা চিঠির ড্রাফট টাইপ করতে স্বরু করল।

একদিন বললাম, 'তুমি বরং আরো কিছুদিন ছুটি নাও।'

অঞ্জলি বলল, 'আর ছুটি নিয়ে কি করব যতীশদা। আমি অফিসেই ভালো থাকি।'

সে ভালো থাকে কিন্তু আমরা তো ভালো থাকিনে। আমাদের মনে হয় এক শূন্য শ্মশানে বসে আছি। হাসি নেই, কৌতুক নেই, জীবনের সাড়া নেই, এক নিষ্প্রাণ মরুভূমি আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে।

নিজের সস্তা রেষ্টুরেণ্ট থেকে পরেশ টিফিনের সময় মাঝে মাঝে চা কাটলেট এনে খেত, খাওয়াত। আজকাল সব বন্ধ হয়ে গেছে। চপ কাটলেট তো দূরের কথা, সামান্য চা টোষ্টটা খেতে পর্যন্ত আমাদের কেমন কেমন লাগে। কারণ অঞ্জলি কিছু খায় না, অনুরোধ করলেও না। আস্তে বলে, 'আপনারা খান।'

আমরা বাইরে গিয়ে যাহোক কিছু খেয়ে আসি।

টিফিনের সময়ও নিজের চেয়ার ছেড়ে নড়েনা অঞ্জলি। শুধু মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি দেখে

সেই নয়নে। বোধহয় কিছুই দেখে না। দুপুরের রোদ
করে। বিকেলের রোদ নরম হয়ে আসতে আসতে
তারপর সন্ধ্যার কালো ছায়া নামে। অঞ্জলি তাকিয়েই থ
এমনি করে মাস গেল, বছর গেল, দ্বিতীয় বছরও যায় যা
একটু নতুন দৃশ্য চোখে পড়ল আমাদের। অঞ্জলির ফিতে পে
পাড়ের রঙ আর কালো নেই, সবুজ হয়ে উঠেছে। শাশুড়ীর
থান ছেড়ে ও প্রথমে কালো চুল পেড়ে তারপরে ফিতে পে
পরে আসছিল। গলায় সেই সরু চিলতে হার, আর
'একগাছি করে' সরু সোনার চুড়িও পরছিল ক'মাস ধরে
পাড়ের রঙ সবুজ এর আগে আর দেখিনি। আর দেখলাম
মোটা একখানা রবীন্দ্র রচনাবলী। তার ভিতরে সেই
রঙের ট্রামের টিকিটের পতাকা। বইখানি যে সুরেনের
বলে দিতে হয়না। চামড়ায় বাঁধানো বইটির পুটের একে
সোনার জলে সুরেনের নাম লেখা আছে।
সেদিন দুজনে ওরা একটু বাদে বাদে অফিস থেকে
যাওয়ার পর আমি আর পরেশ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।
পরেশ বলল, 'ভালো, এ ভালো। আগে থেকে কোন
দিয়ো না হে। চুপচাপ থাকো।'
আমি বললাম, 'তুমি সাবধান।'
'ভালোইতো। অঞ্জলি ওই টিকিটের গোলাপী রঙ য
ওর শাড়িতে লাগে, ওর দুটি গালে যদি সেই রঙের আভা
যায়, আর সেই আগেকার মত যদি একটি গাঢ় রক্ত রঙের
ওর কালো খোঁপায় ফুটে ওঠে আমরা খুসিই হব। সেই
সাধন যদি আমাদের সুরেন যদি করতে পারে আমরা খু
হব। ওতো এখনো বিয়ে করেনি।'
যতীশ কথা থামিয়ে সেই ভবিষ্যৎ ছবির কল্পনায় একটুকাল
রইল। তারপর বলল, 'চল এবার উঠি। রাত অনেক হলো
বন্ধুর হাতের মধ্যে হাত রেখে পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়লাম

—শেষ—